ANIK



হরর কাহিনি

আরেক ড্রাকুলা

অনীশ দাস অপু

FUAD

হরর কাহিনি

আরেক ড্রাকুলা

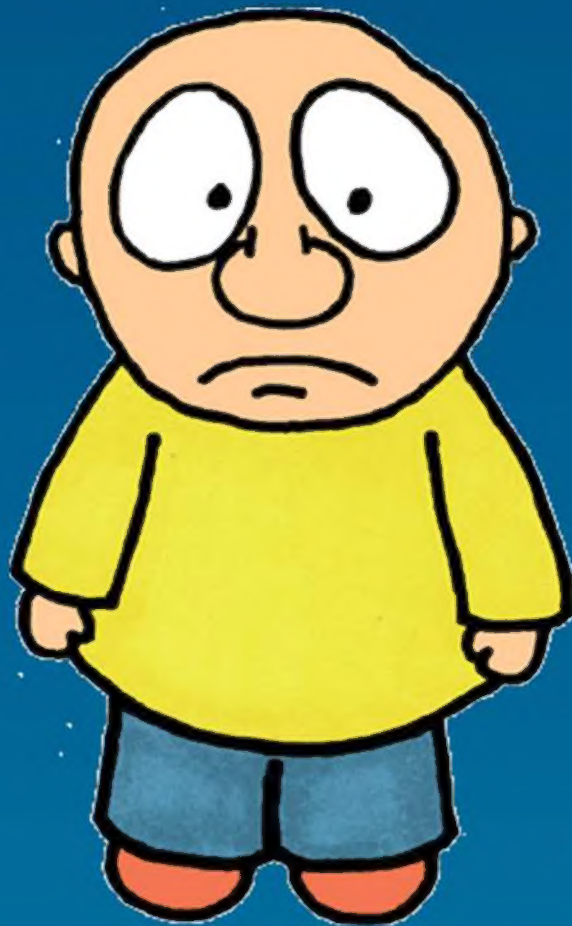
অনীশ দাস অপু

আপনি হরর গল্প পড়ে বেশি ভয় পেতে চান
নাকি কম ভয়? আরেক ড্রাকুলা-য়
সব রকম ভয়ের ব্যবস্থা আছে। কোনও গল্প
পড়ে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে,
কোনওটা শরীরে জাগিয়ে তুলবে শিহরণ
আবার কোনও গল্প করবে চমকিত।
কিছু গল্পে পাবেন খাঁটি পিশাচ কাহিনির স্বাদ,
আবার কিছু গল্প পড়ে হবেন রোমাঞ্চিত।
টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদের গল্পগুলো
যে খারাপ লাগবে না, এটুকু গ্যারান্টি রইল!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

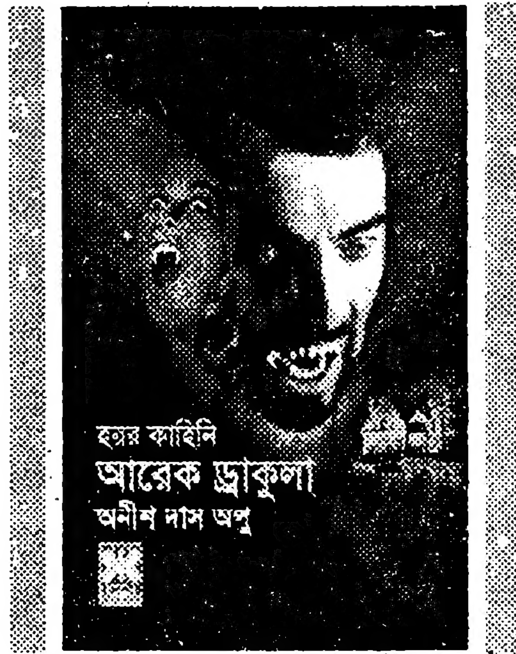
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক (সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



হরর কাহিনি

আরেক ড্রাকুলা

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-0236-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৮

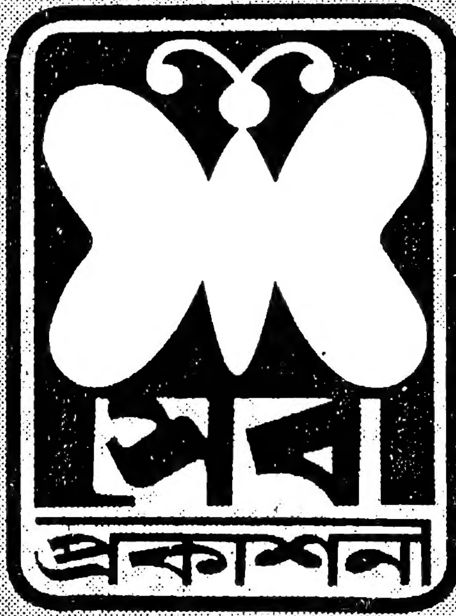
প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
e mail sebaprok@citechco net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩



আটত্রিশ টাকা

AREK DRAKULA
Horror Stories
By: Anish Das Apu

উৎসর্গ-

মোঃ রাইসুল ইসলাম

একজন স্বপ্নবাজ মানুষ

এবং তাঁর অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু

রনি ও রায়হানকে-

সূচি

ভূমিকা

হরর ও পিশাচ কাহিনির আধ ডজন সংকলন সম্পাদনা করে পাঠকদের কাছ থেকে আশাতীত সাড়া পেয়েছি। তবে প্রায় প্রতিটি পাঠক জানতে চেয়েছেন—আমার নিজের লেখা বই কবে পাবেন? আমি সবাইকেই আশ্বাস দিয়েছিলাম সময় পেলেই নিজের একটি গল্প সংকলন বের করব। সে চেষ্টার ফল—**আরেক ড্রাকুলা।**

আরেক ড্রাকুলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এ বই পাঠকদের নানান বিচিত্র অনুভূতির স্বাদ দেবে। কোনও গল্প পড়ে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে, কোনওটি পিলে চমকে দেবে, আবার কিছু গল্পে ভূত-প্রেত না থাকলেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে শরীর 'সাবরিনা' 'পাখি' এবং 'নীল কার্পেট' এরকমই গল্প। 'থাবা' 'ভুতুড়ে বাড়ি' এবং 'আরেক ড্রাকুলা' খাঁটি পিশাচ কাহিনি। 'ছায়া-মানব' 'প্রত্যাবর্তন' এবং 'চিলেকোঠা' পড়ে শিরশির করে উঠবে গা। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা 'রক্তচক্ষু'র ভয়াল আবহ শিহরণ জাগাবে শরীরে। 'সেলারে কে?' ভীত করে তুলবে আপনাকে। 'মন্দিরের পিশাচ' খানিকটা ফ্যান্টাসি ধরনের হলেও মন্দ লাগবে না আশা করি।

গল্প সংকলনটি রেডি করার পরে এর জুৎসই নাম খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এসব ক্ষেত্রে যিনি সবসময় পরিত্রাতার ভূমিকা

পালন করেন, এবারও এগিয়ে এলেন সেই তিনি—আমার প্রিয় টিংকু ভাই। এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি বহুদিন হরর উপন্যাস লিখছি না বলে অভিযোগ করেছেন বহু পাঠক। টিংকু ভাইও বেশ ঠেলা-ধাক্কা দিচ্ছিলেন। তাঁর, উৎসাহে এবং পাঠকের অনবরত দাবির মুখে আমাকে অবশেষে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই হলো। পাঠক, অচিরেই আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি 'বিভীষিকা' নামে একটি হরর সিরিজ নিয়ে। এই সিরিজের প্রথম বইটির নামও নির্বাচিত হয়ে গেছে—**কিংবদন্তির প্রেত** । দুর্দান্ত একটি পিশাচ কাহিনি। তবে দুর্বলচিত্তদের এ বইটি পড়া বারণ। শুধু এটি নয়, 'বিভীষিকা' সিরিজ থেকে অন্যান্য যেসব হরর ও পিশাচ কাহিনি বেরুবে, খুব সাহসী পাঠক ছাড়া বইগুলো রাতের বেলা না পড়াই ভাল!

অনীশ দাস অপু
মুঠোফোন: ০১৭১২৬২৪৩৩৬

আরেক ড্রাকুলা

ট্রানসিলভানিয়া পাহাড়ের কোলে এসে ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রেন। ছোট কম্পার্টমেন্টের জানালা দিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে বাইরে তাকাল স্টেফানি আর্চার।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল সে। সামনের সীটে বসা ওর মা এবং ভাই জবাবে কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

'ভাগ্যিস এখনও দিনের আলো আছে,' বলল স্টেফানি। চারপাশের ঘন, সবুজ বনভূমিতে চোখ বুলাচ্ছে।

'ভ্যাম্পায়ারের ভয় পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ওর ভাই।

'জ্বী,' মুখ বাঁকাল স্টেফানি।

'তোমাকে ড্রাকুলা পড়ে শোনাই? ট্রানসিলভানিয়া দিয়ে যাচ্ছি–ড্রাকুলা পড়ার এটাই মোক্ষম সময়।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মিসেস আর্চার। 'তুই পারিসও, রবার্ট।'

এমন সময় ট্রাকের সঙ্গে মৃদু ঘষা খেল চাকা, আবার চলা শুরু করল ট্রেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে পেল স্বাভাবিক গতি।

মখমলের পুরানো আসনে হেলান দিয়ে বসল স্টেফানি। স্বস্তি বোধ করছে। রবার্ট ন্যাপস্যাক খুলে ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলার ছেঁড়াখোঁড়া একটা কপি বের করল। মিসেস আর্চার ডুবে আছেন তাঁর উপন্যাসে। ওদের কম্পার্টমেন্টে ছ'জন যাত্রী বসার ব্যবস্থা থাকলেও অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

রবার্ট ড্রাকুলা থেকে পড়া শুরু করল।

'ওখানে শুয়ে আছে কাউন্ট, যেন ফিরে পেয়েছে নব যৌবন

তার সাদা চুল এবং গোঁফ এখন কালো, চিমসানো গাল ভরাট, ফ্যাকাসে চামড়ায় ফুটে আছে লালচে আভা, মুখ লাল, ঠোঁটে তাজা খুন, কষ বেয়ে ঝরছে রক্ত, থুতনি বেয়ে নেমে আসছে গলায়।'

'ব্যস হয়েছে,' বাধা দিল স্টেফানি। 'এবার থাম, রবার্ট।'

'ভৌতিক এলাকা দিয়ে যাচ্ছি, তাই বই পড়ে গা ছমছমে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছি,' বলল রবার্ট। 'কোথায় ভাবলাম ব্যাপারটা উপভোগ করবে, তা না। বাধা দিচ্ছে!' গজগজ করল সে।

'স্টেফানির ড্রাকুলা শুনতে ভাল্লাগছে না,' বললেন মিসেস আর্চার। 'পড়তে হবে না। কাল বুখারেস্টে তোদের বাবাকে পাবি। তাঁর সামনে দু'ভাই বোনে মিলে যত ইচ্ছা ঝগড়া করিস। এখন একটু ক্ষান্ত দে, বাপ!'

রবার্ট বইটি তুলে নিল আবার, পড়তে লাগল। তবে এবার নিঃশব্দে। স্টেফানি জানালা দিয়ে তাকাল। একটা উপত্যকা ছাড়িয়ে পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে ট্রেন।

'এ জায়গাটা একটু শোনো!' চেঁচিয়ে উঠল রবার্ট। আবার জোরে জোরে পড়তে লাগল:

'যে রক্তে গোসল করেছে সে। পিশাচটা ঘিনঘিনে একটা জোঁকের মত পড়ে আছে...'

'মা, ওকে থামতে বলো।'

'আচ্ছা থামছি, থামছি।' বলল রবার্ট। 'তুমি এমন ভীতুর ডিম জানতাম না, স্টেফানি।'

ঠিক তখন আরেকটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ট্রেন। তিনজনই বাইরে তাকাল কোথায় এসেছে দেখার জন্য। স্টেশনের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল, 'মেহাডিয়া।'

'অল্প ক'জন যাত্রী উঠছে... জানালা দিয়ে মুখ বের করল

রবার্ট।

'আমাদের এখানে কেউ না এলেই হলো,' বলল স্টেফানি।

এক মিনিট পরে করিডরে ভেসে এল পায়ের শব্দ, খুলে গেল কম্পার্টমেন্টের দরজা। বেঁটেমত, বয়সী এক লোক উঁকি দিল।

'আপনাদের সঙ্গে বসতে পারি? অন্য কম্পার্টমেন্টগুলো দেখলাম ভর্তি।'

'অবশ্যই,' বললেন মিসেস আর্চার। 'প্লীজ, আসুন।'

দরজার ধারে, স্টেফানির পাশে বসল বৃদ্ধ। পরনে নিখুঁত ছাঁটাইয়ের সুট।

'আমি ডা. মুরের। আপনারা নিশ্চয় আমেরিকান?'

'জ্বী। আমি মিসেস রিটা আর্চার, ও আমার মেয়ে স্টেফানি আর এ আমার ছেলে রবার্ট।'

সবার দিকে হাসিমুখে তাকাল বুড়ো। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

ট্রেন চলতে শুরু করেছে আবার, বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে।

'আপনি কোথায়...' ডাক্তারকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন মিসেস আর্চার, বাধা পেলেন কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে যাওয়ায়।

লম্বা, মধ্যবয়সী এক লোক ঢুকল। একটিও কথা না বলে হেঁটে এল জানালার ধারে, বসল স্টেফানির অপর পাশে।

নতুন লোকটির দিকে এক ঝলক তাকাল স্টেফানি। দেখল লোকটার কালো চুল, সাদা, ফ্যাকাসে চামড়া...এবং লাল ঠোঁট। টকটকে লাল।

রবার্টের দিকে তাকাল স্টেফানি। চোখাচোখি হলো দু'ভাই-বোনের। একটা ভুরু তুলল রবার্ট। আগন্তুকের আগমনে কম্পার্টমেন্টের শান্ত, সুন্দর পরিবেশের কোথায় যেন একটা তার ছিঁড়ে গেছে। কী বলবে যেন কেউ বুঝতে পারছে না।

অস্বস্তি নিয়ে নড়ে উঠল স্টেফানি, বৃদ্ধ ডাক্তারের দিকে একটু সরে বসল। লোকটার হাতে তার হাত লেগে গিয়েছিল। ভীষণ ঠাণ্ডা হাত—অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। শিউরে উঠল স্টেফানি। শীত লাগছে।

'রবার্ট, আমাকে একটা সোয়েটার দেবে?'

'আ...ওহ্, হ্যাঁ।' সিধে হলো রবার্ট। হাত বাড়াল মাথার ওপরের র‍্যাকে। ওর কোল থেকে গড়িয়ে পড়ল ড্রাকুলা, আগন্তুকের পায়ের কাছে।

ঝুঁকল রবার্ট বই নিতে। আগন্তুক হাড্ডিসার হাতে আগেই তুলে নিয়েছে বই। ফিরিয়ে দিল রবার্টকে। কৃত্রিম হাসি ঠোঁটে, কঠিন চাউনি কালো চোখে।

সোয়েটারের কথা ভুলে গেছে রবার্ট, পড়ায় ডুবে গেল আবার। মিসেস আর্চার তাঁর সোয়েটার দিলেন স্টেফানিকে। ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, 'যাত্রা পথে সঙ্গী হিসেবে ডাক্তার থাকলে ভরসা জাগে মনে।' বুড়ো মুচকি হাসল।

কম্পার্টমেন্টে নেমে এসেছে অস্বস্তিকর নীরবতা। আগন্তুক স্টেফানির পাশে বসে আছে মূর্তির মত। আকাশের বুক থেকে দ্রুত নিভে যাচ্ছে আলো, লোকটার সাদা মুখটা বিকট লাগছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর ভান করে লোকটাকে এক পলক দেখল স্টেফানি। ড্রাকুলার কথা মনে পড়ছে। এ লোকটা খুব অদ্ভুত...আর ওরা এ মুহূর্তে রয়েছে ট্রানসিলভানিয়ায়।

'রবার্ট,' বললেন মিসেস আর্চার। 'বাতিটা জ্বালিয়ে দাও। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পড়তে পারছি না।'

রবার্ট বাতির সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েছে, খপ করে ওর হাত ধরে ফেলল বৃদ্ধ ডাক্তার।

'প্লীজ, মিসেস আর্চার, আরেকটু পরে বাতি জ্বালান। আমি

প্রায়ই এ দেশে ভ্রমণ করি। সাঁঝ বেলায় এদিকটা অপূর্ব সুন্দর দেখায়। আধঘণ্টা পরে আকাশে আশ্চর্য সব আলোর খেলা দেখতে পাবেন। অমন সুন্দর দৃশ্য নিশ্চয় মিস করতে চাইবেন না।'

'ঠিক আছে, ডক্টর,' বললেন মিসেস আর্চার।

সীটে মাথা রাখল স্টেফানি। সাঁঝবেলার সৌন্দর্য সে-ও উপভোগ করতে পারত, যদি পাশে এ লোকটা না থাকত...

তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরল ট্রেন, সবাই হেলে গেল ডান দিকে। আগন্তুকের সঙ্গে ঘষা খেল স্টেফানির গা। সে সরে যেতে চাইল। কিন্তু লোকটা এবং ডাক্তারের মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে আছে সে। ট্রেন আবার সোজা চলতে শুরু করেছে অথচ লোকটা স্টেফানির গা ঘেঁষে বসেই আছে, সরছে না। লোকটার দিকে তাকাল ও। হিম শীতল চাউনি। স্টেফানির ইচ্ছে করল গলা ফাটিয়ে চিৎকার দেয়। মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল লোকটা।

অর্সোভা নামে ছোট একটি গাঁয়ের স্টেশনে এসে থেমে গেল ট্রেন। হঠাৎ, ঝট করে উঠে দাঁড়াল আগন্তুক তারপর কাউকে কিছু না বলে, যেভাবে এসেছিল, তেমনি দ্রুত বেরিয়ে গেল কম্পার্টমেন্ট থেকে।

ওরা দেখল লোকটা স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটছে। ওখানে অপেক্ষা করছে এক তরুণী। ট্রেন স্টেশন ছাড়ছে, দু'জনকে চুম্বনরত দেখল স্টেফানি।

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল স্টেফানি এবং রবার্ট। তারপর ফেটে পড়ল হি হি হা হা হাসিতে। মিসেস আর্চারও হাসলেন। জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন। একটু পরেই পৌঁছে যাবেন গন্তব্যে। বৃদ্ধ ডাক্তারও হাসল সবার দিকে তাকিয়ে।

'তোরা পারিসও বটে,' স্টেফানি এবং রবার্টকে বললেন মিসেস আর্চার। 'এখন হাসাহাসি বন্ধ কর।' তবে তিনিও না হেসে

পারলেন না।

'আমি একটু ফ্রেশ হয়ে নিই,' বললেন তিনি। সিধে হলেন। মাথার ওপরের র‍্যাকে হাত বাড়ালেন। নামিয়ে আনলেন ব্যাগ। ব্যাগ খুলে আয়না বের করলেন। চেহারা দেখলেন। আয়নায় স্টেফানিকেও দেখা যাচ্ছে। তবে একা।

'আরি...ডাক্তার গেল কই...' ঘুরলেন মিসেস আর্চার। অবাক হয়ে দেখলেন ডাক্তার তার জায়গাতেই বসে আছে। স্টেফানির পাশে।

আশ্চর্য তো! ভাবলেন মিসেস আর্চার। প্রসাধনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তবে সাজগোজ করা হলো না। কারণ ট্রেন পাহাড়ি টানেলে ঢুকে পড়েছে। মিসেস আর্চার হেলান দিলেন সীটে।

আত্মা কাঁপিয়ে বেজে উঠল ট্রেনের তীক্ষ্ণ সাইরেন। টানেলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চাকার ঘরঘর আওয়াজ। কম্পার্টমেন্টে কালি গোলা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু ট্রেনের চাকার ঘটাং ঘটাং শব্দ।

তিন মিনিট পরে সুড়ঙ্গ ছেড়ে বেরিয়ে এল ট্রেন। সাঁঝের আবছা নীলচে আলো কম্পার্টমেন্টে।

'স্টেফানি!' আর্তনাদ করে উঠলেন মিসেস আর্চার।

সীটে হেলান দেয়া স্টেফানি, মাথাটা অদ্ভুতভাবে পেছন দিকে বেঁকে আছে। ওর ঘাড়ে ছোট ছোট দুটো গর্ত। গর্ত থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে রক্ত। অস্বাভাবিক একটা হাসি স্টেফানির ঠোঁটে।

'ডাক্তার,' ফিসফিস করল ও।

কিন্তু কম্পার্টমেন্টে ডাক্তার নেই।

এমন সময় মেঘ কেটে গিয়ে ট্রানসিলভানিয়ার আকাশে ঝলমলে আলো নিয়ে উদ্ভাসিত হলো রুপোর থালার মত পূর্ণিমার চাঁদ।

সেলারে কে?

সেলারটি বেশ বড় তবে বাড়ির অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যে বাড়িটি তুলেছিল সে-ই এ কাণ্ড ঘটিয়েছে। সম্ভবত প্রথম বাড়িটি আগুনে পুড়ে যায়। দ্বিতীয় বাড়িটি পরে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়।

আঁকাবাঁকা একটি সিঁড়ি রান্নাঘরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সেলার। বাড়ির মালিক সিঁড়িতে বাড়ির যত আবর্জনা স্তূপ করে রেখেছে। জ্বালানি কাঠ, শীতকালীন সব্জি সহ নানা হাবিজাবি জিনিস। আবর্জনা বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠে রীতিমত একটা দেয়াল তৈরি করে ফেলেছে। ওই দেয়াল না ব্যারিকেডের পেছনে কী আছে কেউ জানে না। জানার আগ্রহও নেই। গত একশো বছরে কেউ ওই দেয়াল ফুঁড়ে পেছনের সেলারের অন্ধকারে উঁকি দিতে যায়নি।

সিঁড়ির মাথায়, সেলার থেকে রান্নাঘরে বিছিন্ন করে রেখেছে ওক কাঠের মোটা দরজা। বিরাট তালা ঝুলছে দরজায়।

শৈশব থেকেই রান্নাঘর নিয়ে একটা ভীতি রয়েছে টমি টাকারের। ভীতির কারণ ওই সেলার। সে সামনের পার্লারে, দোতলার ডাইনিং রুমে গেলে স্বাভাবিক বাচ্চার মতই আচরণ করে। কিন্তু ওকে কিচেনে নিয়ে যান, তারস্বরে জুড়ে দেবে কান্না। ওর বাবা মা রান্নাঘরে বসেই খাওয়া সেরে নেয়। টমির মা'র

বেশিরভাগ সময় কেটে যায় রান্নাঘরে। হাঁটতে শেখার আজ পর্যন্ত মা'র সঙ্গেই থাকতে হয়েছে টমিকে। এবং সেটা নিতান্ত নিরানন্দচিত্তেই।

হামাগুড়ি দিতে শেখার পরে রান্নাঘরে আর থাকতে চাইল না সে। মা তার দিকে পিঠ ফেরানো মাত্র খুদে বাচ্চাটা যত দ্রুত পারে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে, ঢুকে পড়ে ডাইনিং রুমে, সেখান থেকে ফ্রন্ট পার্লারে। কিচেন থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র শান্তি অনুভব করে টমি, থেমে যায় কান্না। কিন্তু মা পুত্রধনকে চোখের আড়াল করতে অনিচ্ছুক হলে আবার ধরে নিয়ে আসেন রান্নাঘরে। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু হয়ে যায় টমির।

ছেলেটাকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেই হাপুস নয়নে কেন কাঁদতে থাকে তা জানা গেল টমি কথা বলতে শেখার পরে। কিন্তু টমি তার ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করলেও বাবা-মা খুব একটা পাত্তা দিলেন না। হয়তো বিষয়টি তাঁরা বুঝতেই পারেননি।

টমি জানাল: সেলারের দরজা যখন বন্ধ থাকে, ঝুলতে থাকে তালা, সে রান্নাঘরে বসে অন্তত শান্তিতে খানা খেতে পারে। কিন্তু দরজা যদি এমনি বন্ধ থাকে, খোলা থাকে তালা, সে ভয়ে কাঁপতে থাকে, তবে কোনও শব্দ করে না। কিন্তু দরজা খোলা থাকলে, অতি সামান্য ফাঁক দিয়েও যদি দেখা যায় ভেতরের অন্ধকার, তিন বছরের টমির কান্নার চোটে হেঁচকি উঠে যায়। বিশেষ করে তার বাবা যদি তাকে ওই সময় রান্নাঘর থেকে বেরুতে না দেয়।

রানাঘরে খেলতে গিয়ে দুটি অভ্যাস রপ্ত করল ছেলেটি। ছেঁড়া কার্পেট, কাগজের টুকরো, কাঠের ছিলকা, যা-ই হাতের কাছে পেল, সব ঠেসে ঠেসে ঢোকাল মোটা ওক কাঠের দরজার চৌকাঠে। যাতে খালি জায়গাটা ভরাট হয়ে যায়। মিসেস টাকার

যতবার দরজার খুললেন, ছেলের রেখে দেয়া আবর্জনা পরিষ্কার করতে হলো। তিনি বিরক্ত হলেন। ছেলেকে এজন্য একাধিকবার চড়-থাপ্পর দিয়েও লাভ হলো না। সে সুযোগ বুঝে তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। আর দ্বিতীয় অভ্যাসটি দরজা বন্ধ করে তালা লাগাবার পরে, সে সাহস নিয়ে হেঁটে যায় দরজার সামনে। বন্ধ তালায় আদর করে হাত বুলায়। এমনকী খুব ছোটবেলাতেও সে বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর করে হাত বাড়িয়ে বন্ধ তালার স্পর্শ পেতে চাইল। বড় হবার পরে সে তালায় চুমু খেতে শুরু করল।

বাপের সঙ্গে ছেলের দেখা হয় সন্ধ্যার পরে, বাবা কাজ থেকে ফেরার পরে। তিনি ছেলের এরকম বিচিত্র আচরণের কোনও মানে খুঁজে পান না। তিনি ছেলের ভয় ভাঙিয়ে দেয়ার নানা চেষ্টা করেন। তাতে কাজ হয় না। না হওয়ারই কথা। শ্রমিক শ্রেণীর মানুষটি একটি শিশুর মন-মানসিকতা বুঝবেন কী করে? তিনি শুধু একটা কথাই বুঝতে পারেন তাঁর ছেলে যে আচরণ করছে তা খুবই অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক।

টমি তার মাকে ভালবাসে। সে মা'র ঘরকন্নায় সাহায্য করে। কিন্তু একটা কাজ সে কখনও করে না এবং কোনও দিন করবেও না–বাড়ি এবং সেলারের মাঝখানে কোনও জিনিস নিয়ে যাওয়া। মা সেলারের দরজা খুললেই সে চিৎকার করে ওখান থেকে ছুটে পালায়, দরজা বন্ধ করার আগে আর তাকে রান্নাঘরের ধারে কাছেও দেখা যায় না।

কেন এরকম করছে এর কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি টমি। আসলে বিষয়টি নিয়ে কথাই বলতে চায় না সে। বাবা-মা ছেলের ভয় ভাঙানোর বহু চেষ্টা করেছেন। লাভ হয়নি। শেষে তাঁরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

ছয়ে পড়ল টমি। এবারে ওকে স্কুলে ভর্তি করা দরকার টমি

এখন গায়ে-গতরে বেশ শক্তপোক্ত, মস্তিষ্কে বুদ্ধিও রাখে। এ বয়সীদের গড়পড়তার চেয়ে তার মাথা ভাল। মি. টাকার ছেলেকে নিয়ে গর্ববোধ করেন। কিন্তু সেলারের দরজার প্রতি সন্তানের অজানা ভয়ের কারণ খুঁজে পান না বলে দুশ্চিন্তাতেও থাকেন। শেষে ছেলেকে নিয়ে পড়শী ডাক্তারের কাছে গেলেন টাকার দম্পতি। 'সমস্যা হলো ডা. হথর্ন,' বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন মি. টাকার, 'আমাদের ছোট্ট টমিকে শীঘ্রি স্কুলে ভর্তি করব। কিন্তু আমাদের সেলার নিয়ে কী একটা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে ও। একেবারে বাচ্চাদের মত আচরণ করতে থাকে। ভাবলাম আপনার সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি। হয়তো ওর নার্ভে কোনও গণ্ডগোল আছে।' 'একেবারে শৈশব থেকে,' যোগ করলেন মিসেস টাকার, 'সেলার নিয়ে প্রচণ্ড ভয়ে আছে টমি। ও এখন বড় হয়েছে, কিন্তু এখনও ও আমাকে সেলারে যেতে দিতে চায় না স্বাভাবিক আচরণ করছে না ও। ওকে দেখেছি আবর্জনা স্তূপ করে রাখে সেলারের দরজার চৌকাঠে, তালায় চুমু খায়। এরকম চলতে থাকলে পরিণত বয়সে ও না পাগলই হয়ে যায়।'

রোগী পেয়ে খুশি ডা. হথর্ন, মেডিকেলের ছাত্র থাকাকালীন নার্ভাস সিস্টেমের ওপর শোনা কিছু লেকচারের কথা স্মরণ করে টাকার দম্পতিকে কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করলেন, টমির নাড়ি টিপে দেখলেন, পরীক্ষা করলেন লাংস, ওর চোখ এবং নখের ডগাও পরখ করলেন।

'ওর শরীরে তো কোনও রোগ নেই,' অবশেষে বললেন ডাক্তার।

'জ্বী, শুধু সেলারের দরজা নিয়ে ভয় ছাড়া,' বললেন বাপ।

'ওর কি কখনও অসুখ করেছিল?'

'নাহ্। শুধু বার দুই কাঁদতে কাঁদতে ফিট হয়ে গিয়েছিল।

তখন ওর মুখ নীল দেখেছি।' জানালেন মা।

'ভয়ের চোটে?'

'হতে পারে। রান্নাঘরে ওকে নিয়ে গেলেই কাঁদত।'

'আপনারা একটু বাইরে যান। আমি টমির সঙ্গে কথা বলব।'

ডাক্তার নড়েচড়ে আরাম করে বসলেন। ছয় বছরের বাচ্চাটি অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে বসে থাকল।

'টমি, সেলারে এমনকী আছে যে জন্য তুমি ভয় পাচ্ছ?'

'জানি না।'

'তুমি ওখানে কখনও কিছু দেখেছ?'

'না, সার।'

'কিছু শুনেছ? গন্ধ পেয়েছ?'

'না, সার।'

'তা হলে তুমি কী করে ভাবলে ওখানে কিছু আছে?'

'কারণ ওখানে ওটা আছে।'

টমিকে যতবার প্রশ্ন করা হলো সেলারে কী আছে, প্রতিবারই জবাব এল, 'জানি না। তবে ওখানে ওটা আছে।' শেষে টমির বাপের মতই বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন ডা. হথর্ন। তিনি দরজার সামনে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন টাকার দম্পতিকে।

'ওর ধারণা সেলারে কিছু একটা আছে,' বললেন তিনি। একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন টাকার দম্পতি।

'ওখানে কিছুই নেই,' অবশেষে বললেন মি. টাকার।

'ওটা স্রেফ সাধারণ একটা সেলার। হাবিজাবি জিনিস, লাকড়ি আর সিডার কাঠের কয়েকটা ব্যারেল ছাড়া কিছু নেই,' বললেন মিসেস টাকার। 'ওই বাড়িতে আসার পরে বহুবার সেলারে ঢুকেছি আমি। খুব ভালভাবেই জানি ওখানে কিছু নেই। কিন্তু যতবার সেলারের দরজা খুলেছি, ততবার আমার বাচ্চাটা ভয়ে চিৎকার

দিয়ে উঠেছে। ও যখন আমার কোলে, তখনও সেলারের দরজা খুললে কেঁদে উঠত।'

'ওর ধারণা ওখানে কিছু একটা আছে,' পুনরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার।

'এজন্যই ওকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি,' বললেন বাবা।

'ওর মাথায় বোধহয় গণ্ডগোল আছে।'

'কী করবেন বলছি,' পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। 'টমির ধারণা সেলারে কিছু আছে। ও যখন দেখবে আসলে ওখানে কিছু নেই, ভয়টা কেটে যাবে। বিষয়টি ওর মনে গেঁথে আছে কারণ এ নিয়ে আপনারা ওকে অনেক বকাঝকা করেছেন, হাসাহাসি করেছেন। আপনারা সেলারের দরজা খুলে রাখবেন, ও একা থাকবে রান্নাঘরে। দরজায় পেরেক মেরে রাখবেন যাতে টমি দরজা বন্ধ করতে না পারে। ও ঘণ্টাখানেক একা থাকবে রান্নাঘরে। তারপর আপনারা ওর কাছে যাবেন। তখন সবাই মিলে হাসাহাসি করবেন, ও-ও বুঝতে পারবে এতদিন শূন্য সেলার নিয়ে বেহুদাই ভয় পাচ্ছিল। আমি নার্ভ এবং ব্লাডের দুটো টনিক লিখে দিচ্ছি। শরীরে বল পাবে। তবে আসল কথা হলো ওকে বোঝাতে হবে যে ভয় পাবার কিছু নেই।'

বাড়ি ফেরার পথে টমি হঠাৎ বাবা-মার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দিল ছুট। ওকে পাকড়াও করতে বেশ বেগ পেতে হলো ওঁদেরকে। বাকি পথটা দু'জনে ছেলের দু'হাতে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে রাখলেন। বাড়িতে ঢোকার পরে হঠাৎ নেই হয়ে গেল টমি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তাকে গেস্টরুমের খাটের নীচে পাওয়া গেল। লুকিয়েছে। ছেলের জন্য বিকেলটাই মাটি মি. টাকারের। সারা দিন ওর পেছনেই তাঁকে দৌড়ঝাঁপ করতে হলো, বহু সাধ্যসাধনা করেও রাতের খাবার ছেলের মুখে তুলতে পারলেন না

মা। বাসন-কোসন ধুয়ে, সান্ধ্যকালীন পত্রিকা পড়া শেষ করে, পাইপ ফোঁকার পরে মি. টাকার তাঁর টুল বক্স নিয়ে বসলেন। বের করলেন হাতুড়ি এবং খানকয়েক লম্বা পেরেক।

'আমি দরজায় পেরেক মারব, টমি, তা হলে তুই আর দরজা খুলতে পারবি না। রান্নাঘরে এক ঘণ্টা তোকে একা থাকতে হবে। বাতি জ্বালানো থাকবে। তুই যখন বুঝতে পারবি ভয় পাবার কিছু নেই, তখন সত্যিকারের একজন পুরুষ মানুষ হয়ে উঠবি। তোকে নিয়ে আমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না।'

কিন্তু শেষমুহূর্তে, ছেলেকে চুমু খাওয়ার সময় কেঁদে ফেললেন মিসেস টাকার, স্বামীকে ফিসফিস করে অনুনয় করলেন থাক, কাজটা করার দরকার নেই। আরেকটু বড় হলে এমনিতেই কেটে যাবে ভয়। কিন্তু স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করলেন না মি. টাকার। তিনি সেলারের দরজায় পেরেক পুঁতে দিলেন যাতে টমি ওটা বন্ধ করতে না পারে। ছেলেটাকে রান্নাঘরে একা রেখে এলেন বাতি জ্বেলে রেখে। টমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খালি, অন্ধকার জায়গাটার দিকে।

ওইদিন ডা. হথর্ন তাঁর এক ক্লাসমেটের সঙ্গে সাপার করছিলেন। ক্লাসমেট একজন মনোবিজ্ঞানী। তবে শিশুদের বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। হথর্ন তাঁর নতুন কেস নিয়ে গল্প করলেন বন্ধুর সঙ্গে, জানালেন সেলার নিয়ে টমির ভয়ের কথা। এ ব্যাপারে বন্ধু, ড. জনসনের মতামত জানতে চাইলেন। ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

'শিশুরা খুব অদ্ভুত স্বভাবের হয়, হথর্ন। তাদের আচার-আচরণ অনেকটা কুকুরের মত। তাদের নার্ভাস সিস্টেম প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়েও তীক্ষ্ণ। আমরা জানি আমাদের দৃষ্টিশক্তি

সীমাবদ্ধ; আমাদের শ্রবণশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তিও তাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আরেকটি জীবন আছে যে জীবন আমরা না পাই দেখতে না পাই শুনতে। কিন্তু আমরা এর অস্তিত্ব যেহেতু প্রমাণ করতে পারি না তাই এ ব্যাপারটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাই। এই টাকার ছেলেটির নার্ভ সিস্টেম অস্বাভাবিক রকমের তীক্ষ্ণ বলেই আমার মনে হয়েছে। সে হয়তো সেলারে সত্যি কিছু একটা দেখেছে যা তার বাবা-মা বিশ্বাস করেনি। তার ভয় পাবার নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। তবে আমি বলছি না যে সেলারে সত্যি কিছু আছে। হয়তো ওটা স্রেফ সাধারণ একটি সেলার। কিন্তু এই ছেলেটি, শিশুকাল থেকে ভেবে আসছে ওখানে কিছু একটা আছে। এই ভয়টাই ওর ক্ষতি করছে। আমি দেখতে চাই সে কেন ভাবছে সেলারে কিছু আছে? ছেলেটার বাড়ির ঠিকানা দাও। আমি কাল বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলব।'

'আমি যে পরামর্শ দিলাম তা নিয়ে তোমার কী অভিমত?'

'তোমার পরামর্শ আমার পছন্দ হয়নি, বন্ধু। তোমার জায়গায় আমি হলে বাড়ি ফেরার পথে ওদের নিষেধ করতাম যাতে ছেলেটাকে রান্নাঘরে বন্দি করে না রাখে। কারণ ছেলেটা ভাবছে সেলারে কিছু আছে।'

'কিন্তু কিছু তো নেই।'

'হয়তো বা নেই। সে নিশ্চয় ভুল ভাবছে। কিন্তু ভাবছে তো।'

এখন খচখচ করছে ডা. হথর্নের মন, বন্ধুর পরামর্শ মেনে নেবেন ঠিক করলেন। ঠাণ্ডা, কুয়াশাঘেরা রাত। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় শীতে যেন জমে গেলেন ডাক্তার। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলেন টাকারদের দোরগোড়ায়। এ বাড়িতে ছয় বছর আগে একবার এসেছিলেন তিনি, টমির জন্মের সময়। সামনের

জানালায় আলো জ্বলছে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন মি. টাকার।

'টমিকে দেখতে এসেছি,' বললেন ডাক্তার।

'ও রান্নাঘরে,' জানালেন বাপ।

'একবার শুধু চিৎকার দিয়ে উঠেছিল, তারপর থেকে ওর আর কোনও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন মিসেস টাকার।

'আমার বউকে ইচ্ছে করেই রান্নাঘরে যেতে দিইনি। টমি এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে ভয় পাবার কিছু নেই। এক ঘণ্টা তো পার হয়েছে, ডাক্তার। ওকে নিয়ে আসি?'

'বাছা আমার না জানি কত ভয় পেয়েছে,' ফিসফিস করলেন মিসেস টাকার।

মোমবাতি হাতে আগে আগে চললেন মি. টাকার, পেছনে তাঁর স্ত্রী এবং ডাক্তার। খুললেন রান্নাঘরের দরজা। ঘর অন্ধকার।

'বাতি নিভে গেছে,' বললেন টমির বাবা। 'দাঁড়ান, আমি আলো জ্বালছি।'

'টমি! টমি!' ডাকলেন মিসেস টাকার।

অন্ধকারে, মেঝেতে সাদা কী একটা জিনিস পড়ে আছে। ডাক্তার ছুটে গেলেন সেদিকে। জোর গলায় হাঁক ছাড়লেন আলো নিয়ে আসার জন্য। কাঁপা হাতে পরীক্ষা করলেন টমির ছিন্নভিন্ন শরীর। চেহারা বিকৃত হয়ে গেল তাঁর। মুখ তুলে চাইলেন সেলারের ঘুটঘুটে অন্ধকারে। অবশেষে ফিরলেন টাকার দম্পতির দিকে।

'টমি–টমি আহত হয়েছে। ও বোধহয় বেঁচে নেই!' ধরা গলায় বললেন তিনি।

উন্মাদিনীর মত ছুটে এলেন মিসেস টাকার। কোলে তুলে

নিলেন রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন শরীরটাকে যা ঘণ্টাখানেক আগেও ছিল তাঁর ছেলে।

মি. টাকার হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ছুটিয়ে আনলেন, বন্ধ করে দিলেন সেলারের দরজা। লাগিয়ে দিলেন তালা। তারপর ডাক্তারের কাছে এলেন তিনি। নাড়া দিলেন কাঁধ ধরে।

'কে ওকে খুন করল, ডাক্তার? কে?' চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

ডাক্তার তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে ভয়।

'আমি কী করে বলব, টাকার?' বললেন তিনি। 'আমি কী করে জানব? আপনারা না বললেন ওখানে কিছু নেই? সেলারে কিছু নেই?'

থাবা

'অনেকদিন আগে বরিশালের বাবুগঞ্জ থানার দেহেরগতি নামে ছোট একটি গাঁয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এক দানব। দানবটাকে কেউ দেখেনি। শুধু তার অস্তিত্বের প্রমাণ ছিল নির্মম শিকারের বলি হওয়া গ্রামবাসী।'

একইভাবে খুন হয়ে যেত সবাই—প্রত্যেকের ঘাড়ে থাবার চিহ্ন। দানব দশটা নখ বসিয়ে দিত শিকারের ঘাড়ে। শুরুতে মানুষ নয়, ছোটখাট প্রাণী দানবের শিকার হচ্ছিল। একদিন সকালে এক চাষা ঘুম থেকে উঠে দেখে তার তিনটা ছাগল রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে রয়েছে। এরপরে গাঁয়ের তিনটে পোষা কুকুরকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সবার ঘাড়ে অদ্ভুত থাবার চিহ্ন।

গুজব ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে। প্রাণীগুলোর অন্তিমদশার কথা জানে সবাই। কিন্তু কেউ বলতে পারে না কীভাবে মারা গেল জানোয়ারগুলো। একটি বাছুরও রক্তক্ষরণে মারা গেল। নিরীহ প্রাণীটির ঘাড়ের শিরা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে দশ আঙুলে। ঘাড়ে দশটি ধারাল নখের চিহ্ন। এরপরে সাবধান হয়ে গেল গ্রামবাসী। বিছানার পাশে দা-কুড়াল-খন্তা রেখে তারা ঘুমাতে লাগল। গোয়াল ঘরে তালা মেরে রাখা হলো পোষা জন্তুদের।

গোটা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। নানানজনে নানান গল্প

বানাতে লাগল। একে অন্যের দিকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

এরপরে ঘটল সেই ঘটনা—যে ভয়টা এতদিন সবাইকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। দানব হামলা চালাল মানুষের ওপর। আক্রমণের শিকার হলো মাতাল জমির উদ্দিন। একদিন সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল তাকে। ঘাড়ে দশটা নখ বসানো চিহ্ন। গর্ত হয়ে আছে। কুকুর, ছাগল এবং বাছুরের মত একই পরিণতি হয়েছে তার। প্রবল রক্তক্ষরণে মারা গেছে। তিন কুলে যার কেউ নেই সেই ভবঘুরে জমির উদ্দিনের মৃত্যুতে গাঁয়ের মানুষ শোক প্রকাশ করল না তবে ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল সবার। কারণ সবাই জেনে গেছে মানুষ শিকারেও অরুচি নেই দানবের। যে কেউ তার শিকার হতে পারে।

ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী এবারে গড়ে তুলল একটি স্বেচ্ছাসেবী দল। তারা রাতের বেলা পালা করে গ্রাম পাহারা দেবে। তবে মুশকিল হলো কেউ জানে না কীসের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে। লিটু আর টিটু নামে দুই ভাইকে করা হলো স্বেচ্ছাসেবী দলের নেতা। এরা গাঁয়ের সবচেয়ে সাহসী দুই তরুণ। একমাত্র এদের বাড়িতেই দু'টি গাদা বন্দুক আছে। বন্দুক দিয়ে তারা মাঝে মাঝে গাঁয়ের পাশের জঙ্গলে শিকার করে। আর এদের বাড়ি জঙ্গলের ধারেই। এবং লোকের ধারণা দানবটা জঙ্গলেই আস্তানা গেড়েছে। ওদের বাছুরটাকেই মেরে ফেলেছে দানব।

স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন হওয়ার পরে লিটু-টিটু বাড়ি গেল কীভাবে রাতে পাহারা দেবে তা নিয়ে আলোচনা করতে। শীতের রাত। তাই রান্নাঘরে উনুন জ্বেলে বসল দুই ভাই। ওদের মা নেই। বাবা আছে। আর বুড়ি দাদী। দাদী প্রায় বেশিরভাগ সময় চুলোর পাশে বসে থাকে গায়ে কালো একটা চাদর জড়িয়ে।

উনুনের উত্তাপ তার শরীর গরম রাখে।

'আজ রাত থেকেই শুরু করব পাহারা,' নিচু গলায় বলল বড় ভাই লিটু। 'দলনেতা হিসেবে আমাদের ওপর এ দায়িত্ব বর্তেছে। তা ছাড়া অন্যরা এখনই পাহারায় যেতে ভয় পাচ্ছে।'

'হুঁ,' সায় দিল ছোট ভাই টিটু। 'ওটা–যাই হোক না কেন–প্রতি পাঁচদিন পরপর হামলা চালায়। জমির উদ্দিন মারা গেছে আজ পাঁচদিন হলো। আজ রাতে আবার ওটা হামলা চালাতে পারে। কাজেই আজই পাহারা বসাতে হবে।'

'তোরা পাহারা দিতে যাচ্ছিস যা,' বলে উঠল ওদের বাবা।

'তবে কীসের সঙ্গে টক্কর দিবি সে কথা মনে থাকে যেন। ওটা কিন্তু আকস্মিক হামলা চালায়। এ পর্যন্ত যে ক'টা হামলা হয়েছে, ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কাজেই খুব সাবধান। আম্মা, আপনি কী বলেন?'

চুলোর পাশে বসা দাদী তাঁর ছেলের দিকে একবার চোখ তুলে চাইলেন। কেন জানি শিউরে উঠলেন। তারপর আবার মুখ নামিয়ে তাকিয়ে থাকলেন জ্বলন্ত চুল্লির দিকে। ওরা তিনজন নিজেদের আলোচনায় ফিরে গেল। বুড়ির কাছ থেকে অবশ্য কোনও জবাব আশাও করেনি। কারণ দাদী স্বল্পবাক মানুষ। তা ছাড়া বেশ ক'বছর ধরে তাঁর মাথারও ঠিক নেই। হঠাৎ হঠাৎ উল্টোপাল্টা সব কাজ করে বসেন।

লিটু তাদের পরিকল্পনার কথা জানাল বাপকে। 'আমি আর টিটু আজ রাতে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে যাব। তবে জঙ্গলে ঢুকব না। জঙ্গল আর গাঁয়ের মাঝখানের রাস্তায় পাহারা দেব। দানবটা যদি আসেই আমাদের চোখ এড়িয়ে গাঁয়ে ঢুকতে পারবে না।'

'তোরা পাহারা দিবি কীভাবে?' জানতে চাইল উদ্বিগ্ন বাবা।

'আমরা একজন আরেকজনের ওপর নজর রাখব,' জবাব দিল

লিটু। 'হাঁক-চিৎকার দিলে শোনা যায় এরকম দূরত্বে থাকব দু'জনে। জঙ্গলের দিকে চোখ থাকবে আমাদের। দানব যদি সত্যি জঙ্গলে থাকে, বেরুনো মাত্র ওকে গুলি করব।'

'কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতেই হবে,' টিটু বলল তার বাবাকে। 'জানি না দানবের পরবর্তী শিকার কে হবে, তবে হাত-পা গুটিয়ে অসহায়ের মত আর বসে থাকা যায় না।'

বাবা মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরল বুকে। 'বেঁচে বর্তে ফিরে আসিস, বাপ।' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল সে।

লিটু দেয়ালে ঝোলানো বন্দুক জোড়া নামাল। টিটু কাঠের সিন্দুক খুলে ধারাল দু'টি রাম দা বের করল। একটা দিল বড় ভাইকে। নিজের কাছে রাখল অন্যটা। তারপর দাদীকে সালাম করে বেরিয়ে পড়ল দু'জনে।

বাইরে ঘোর অন্ধকার। পশ্চিমাকাশে কাস্তের মত একফালি বাঁকানো চাঁদ। পুবদিকে পা বাড়াল দুই ভাই। ওদিকেই জঙ্গল। ওরা যেখানটাতে পাহারায় দাঁড়াবে ভেবেছে, কাছাকাছি আসতে ফিসফিস করল টিটু, 'ভাবছি ওটা দেখতে কেমন।'

'আমিও একই কথা ভাবছি,' বলল লিটু। 'হয়তো কোনও দানব পাখি-টাখি হবে। স্যাৎ করে আকাশ থেকে নেমে এসে ঘাড়ের শিরা ছিঁড়ে পালিয়ে যায়।'

দু'জনেই আকাশে তাকাল। পাতলা, সরু চাঁদটিকে ঘিরে আছে মেঘ। আকাশ থেকে কিছু উড়ে এলেও আঁধারে ঠাহর করা যাবে না।

'ওটা মাটির নীচের কোনও প্রাণীও হতে পারে,' মৃদু গলায় মন্তব্য করল টিটু। 'মাটিতে গর্ত খুঁড়ে থাকে। সুযোগ বুঝে হামলা চালিয়ে বসে পেছন থেকে।'

ছোটভাইয়ের কথা শুনে গা কেমন ছমছম করে ওঠে বড়ভাইয়ের। পেছন ফিরে তাকায় সে। দেখাদেখি টিটুও। কিন্তু নিকষ আঁধারে কিছুই দেখা যায় না। অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দুই ভাই। শেষে নীরবতা ভাঙল লিটু। 'চল্, যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই। তবে বেশিদূর যাসনে। হাঁক ছাড়লেই যেন সাড়া পাই।'

দু'ভাই দু'দিকে চলল। লম্বা লম্বা চল্লিশ কদম ফেলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অন্ধকারে বন্দুকে গুলি ভরল লিটু। তারপর রামদাটা নরম মাটিতে পুঁতল। রামদার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

চল্লিশ কদম দূরে, অন্ধকারে ভীত ভঙ্গিতে বন্দুকে হাত বুলাচ্ছে টিটু। তার হাত কাঁপছে। এতদিন জঙ্গলে খরগোশ, বন বেড়াল এবং বন মোরগ ছাড়া কিছু শিকার করেনি। সাহসী বলে যতই নাম-ডাক থাকুক, ভূতের ভয় তার বেজায়। স্রেফ লজ্জায় না বলতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে পাহারায়। দানবটা ভূত-প্রেত হতে পারে। নইলে তাকে কেউ এতদিন দেখতে পায়নি কেন? ভূতের বিরুদ্ধে কি বন্দুক দিয়ে লড়াই করা চলে? আর ওটা যদি ভূত না-ও হয়, ভয়ঙ্কর কোনও জন্তুও হয়, প্রয়োজনের সময়ে বন্দুক চালাতে পারবে তো সে? বড় ভাইকে দেখতে খুব ইচ্ছা করল টিটুর। কিন্তু ঝোপ এবং গাছের গাঢ় ছায়া যেন গিলে খেয়েছে লিটুকে। দেখা যাচ্ছে না।

ঘুরল টিটু। তাকাল গাঁয়ের দিকে। ইস্, কেন যে মরতে মীটিং-এ সবার সামনে বড় বড় কথা বলেছিল। বাবার সামনেও হামবড়া ভাব দেখিয়েছে, যেন কিছু গ্রাহ্য করছে না। পেছনে টাশ্‌শ্ শব্দে একটা মরা ডাল ভাঙল। চরকির মত ঘুরল টিটু। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না, আর কোনও শব্দও শোনা গেল না।

পেশীতে ঢিল পড়ল টিটুর। বন্দুকের কুঁদো ঠেকাল মাটিতে, হেলান দিল। ঘুম ঘুম আসছে।

আর ঠিক তখন ঘাড়ে সুচের মত তীক্ষ্ণ ব্যথা ফুটল। কেউ ওর গলায় ধারাল নখের থাবা বসিয়েছে।

তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্ত-চিৎকারে ভেঙে খানখান হয়ে গেল বনভূমির নিশি-নৈঃশব্দ্য। লাফিয়ে উঠল লিটু। ওর ভাইয়ের গলা না? এক হাতে বন্দুক, অপর হাতে রামদা নিয়ে চিৎকারের উৎসের দিকে ছুটল ও। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

এমন সময় টিটুর ঘরঘরে গলা শুনতে পেল লিটু। গোঙাচ্ছে। গোঙানি লক্ষ্য করে ছুটল ও। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল গোঙানি। ভাইকে দেখা যাচ্ছে না তবে ওর বেশ কাছে এসে পড়েছে লিটু বুঝতে পারছে। বন্দুকটা ফেলে দিল ও। অন্ধকারে গুলি করলে টিটুর গায়ে গুলি লাগতে পারে। দু'হাতে রামদা ধরে মাথার ওপর বনবন করে দু'পাক ঘোরাল লিটু। কিছু একটার সঙ্গে বাড়ি খেল ধারাল ফলা। রক্ত জল করা একটা চিৎকার শুনল লিটু। গা হিম হয়ে গেল ওর। টিটুর লাগেনি তো? ও তো আর গোঙাচ্ছেও না। অন্ধকারে হয়তো রামদার কোপ ভাইয়ের গায়ে লেগেছে। মারা গেছে সে। বুক ফেটে কান্না এল লিটুর। এমন সময় আবার গোঙাতে শুরু করল টিটু। স্বস্তির পরশ ঝিরঝির করে নামল লিটুর শরীরে। নাহ্, ওর ভাই মারা যায়নি।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেল লিটু। মরা পাতার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কিছু একটা খচমচ শব্দ তুলে। ধেড়ে ইঁদুর-টিদুর হবে হয়তো। তবে ওটাকে দেখতে পেল না লিটু। সে আন্দাজে ভাইয়ের পাশে এসে বসল। তখন মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ক্ষীণকায় চাঁদ। তার অতি অল্প আলোয় টিটুর দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল লিটু। টিটুর ঘাড়ে গেঁথে আছে চিমসানো একটা

কাটা হাত। কাটা কনুই থেকে রক্ত ঝরছে। হাতটার আঙুলে বড় বড় ধারাল নখ। নখগুলো খামচে ধরে আছে টিটুর কাঁধসহ ঘাড়। অন্ধকারে রামদার কোপে এ হাতটাই কেটে ফেলেছে লিটু। সময় মত এসে পড়ায় রক্ষা পেয়েছে টিটু। কাটা হাতের মায়া ত্যাগ করেই পালাতে হয়েছে দানবকে।

লিটু টিটুর ঘাড় থেকে টান মেরে ছুটিয়ে আনল কাটা হাত। নখের আঘাতে গর্ত হয়ে গেছে ঘাড়ে। রক্ত ঝরছে। ক্ষতস্থানে রুমাল বেঁধে দিল লিটু। তারপর ভাইকে নিয়ে রওনা দিল গাঁয়ে। কাটা হাতটা পড়ে রইল জঙ্গলে।

ওদের বাবা ভয়ার্ত শুকনো মুখে অপেক্ষা করছিল দোর গোড়ায়। ছোট ছেলের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। দু'ছেলেই বেঁচে আছে দেখে আনন্দে কেঁদে ফেলল সে।

টিটুকে খাটিয়ায় শুইয়ে দিল ওরা। ডেটল আর পানি দিয়ে পরিষ্কার করল ক্ষতচিহ্ন। আর কয়েক সেকেন্ড দেরী করলেই খবর হয়ে যেত টিটুর। ওকে জ্যান্ত ফিরে পেত না লিটু। ভাইয়ের ঘাড়ে ব্যান্ডেজ করতে করতে দানবের কথা ভাবছিল লিটু। কাটা হাত নিয়ে রক্তক্ষরণে ধুঁকতে ধুঁকতে জঙ্গলেই হয়তো মরে পড়ে থাকবে দানবটা।

আহত টিটুকে নিয়ে লিটু এবং তার বাবা এত ব্যস্ত ছিল যে খেয়াল করেনি চুল্লির পাশে দাদী নেই। দাদী যে খিড়কির দরজা দিয়ে আবার রান্নাঘরে ঢুকেছেন তাও লক্ষ করেনি কেউ। দাদী কাঠের পিঁড়িতে বসে শীতল, ক্রূর চোখে দুই নাতির দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কেউ শুনল না তাঁর অসংখ্য ভাঁজ পড়া মুখ থেকে হিসহিস শব্দ বেরিয়ে আসছে। এবং কেউ দেখল না কালো চাদরের নীচে তিনি রক্তাক্ত একটি মাংসপিণ্ড লুকিয়ে রেখেছেন।

ছায়া মানব

'আপনার কাছে এসেছি আমার গল্পটা বলার জন্য,' ড. হার্পারের কাউচে শুয়ে থাকা লোকটি বলল। তার নাম রহমান ফয়সল, কানেক্টিকাটের ওয়াটারবারির বাসিন্দা। নার্স ভিকার্স-এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এ লোক বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় আসে পড়াশোনা করতে। রিটা নামের একটি আমেরিকান মেয়ে তার প্রেমে পড়ে এবং বিয়ে করে। বর্তমানে সে নিউ ইয়র্কের একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মে কাজ করছে। ডিভোর্সড। সে তিন সন্তানের জনক। সবাই মারা গেছে।

'আমি প্রিস্টের কাছে যাইনি খ্রিস্টান নই বলে। আইনজীবীর কাছে যাব না এটা উকিলদের সঙ্গে কথা বলার কোন বিষয় নয় বলে। আমি যা করেছি তা হলো আমার সন্তানদেরকে হত্যা করেছি। একেকবারে একেকজন। একে একে সবাইকে।'

ড. হার্পার টেপ রেকর্ডারের সুইচ অন করলেন।

ফয়সল কাউচে গজ লাঠির মত সোজা হয়ে শুয়ে আছে। কাউচের শেষ মাথায় গিয়ে ঠেকেছে পা জোড়া। মরা মানুষের মত, বুকের উপর ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে হাত জোড়া। সাদা ছাদের দিকে চোখ, যেন ওখানে সিনেমা দেখাচ্ছে।

'আপনি কি সত্যি ওদেরকে খুন করেছেন নাকি–'

'না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটি। 'তবে ওদের মৃত্যুর

জন্য আমিই দায়ী। অয়ন মারা গেছে ১৯৮৭ সালে, শার্ল ১৯৯১-এ। আর শিহাব এ বছর। আমি ঘটনাটা বলতে চাই।'

ড. হার্পার কোনও মন্তব্য করলেন না। রহমান ফয়সলকে তার বুড়ো ও বিপর্যস্ত লাগছে। ফয়সলের চুল পাতলা হয়ে আসছে, গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। চোখ ফোলা। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণ।

'ওরা খুন হয়েছে, বুঝলেন? তবে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না কথাটা। বিশ্বাস করলে ঘটনা এরকম ঘটত না।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ...'

থেমে গেল ফয়সল, কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হলো, দৃষ্টি চলে গেছে ঘরের কোনায়। 'ওটা কী?' খ্যাক করে উঠল সে। সরু হয়ে এসেছে চোখ।

'কী?'

'ওই দরজাটা।'

'ওটা ক্লজিট,' বললেন ড. হার্পার। 'ওখানে আমার কোট আর জুতো রাখি।'

'খুলুন ওটা। দেখব আমি।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন হার্পার, ঘরের কিনারে হেঁটে গেলেন, খুললেন ক্লজিট। ভিতরে চার-পাঁচটা হ্যাঙ্গারের একটিতে ঝুলছে একটি বর্ষাতি। তার নীচে একজোড়া চকচকে গ্যালোশ। ওর মধ্যে একটিতে যত্নের সাথে ভাঁজ করে রাখা নিউ ইয়র্ক টাইমস।

'ঠিক আছে?' বললেন ড. হার্পার।

'ঠিক আছে।' আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ফয়সল।

চেয়ারে ফিরে এসে বললেন হার্পার, 'বলছিলেন আপনার তিন সন্তানের হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি প্রমাণিত হলে আপনি ঝামেলা মুক্ত হবেন। সেটা কী রকম?'

'আমি জেলে যেতে চাই,' সাথে সাথে জবাব এল। 'সারা জীবনের জন্য।' হাসল ফয়সল। অর্থহীন হাসি।

'আপনার বাচ্চারা খুন হলো কীভাবে?'

'আমার কথা হয়তো বিশ্বাস হবে না আপনার। তবে তাতে কিছু এসে যায় না।'

'আচ্ছা, বলুন।' হার্পার তাঁর পাইপ বের করলেন।

রিটাকে আমি বিয়ে করি ১৯৮৫ সালে–তখন আমার বয়স চব্বিশ, রিটা আঠারো। ও প্রেগন্যান্ট ছিল। তারপর অয়নের জন্ম হলো। ঠোঁট বেঁকে গেল হাসির ভঙ্গিতে, তবে প্রাণশূন্য হাসি। 'কলেজ ছাড়তে হলো আমাকে, একটা চাকরি নিলাম। তবে এ জন্য কিছু মনে করিনি আমি। ওদের দু'জনকেই ভালবাসতাম আমি। দু'জনেই খুব সুখী ছিলাম।'

'অয়নের জন্মের কিছুদিন পরে আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ল রিটা। ১৯৮৯'র ডিসেম্বরে জন্ম হলো শার্লের। শিহাব এল ১৯৯২'র গরমে। ততদিনে মারা গেছে অয়ন। শিহাবের জন্মটা ছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট। রিটা তাই বলেছে আমাকে। বলেছে মাঝে মাঝে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঠিকভাবে কাজ করে না। তবে আমার মনে হয় না ওটা হুট করে হয়ে গেছে। সন্তান পুরুষ মানুষকেও বেঁধে ফেলে। আর মহিলাদেরকে তো আরও। কথাটা সত্যি কিনা?'

হার্পার গলা দিয়ে ঘোঁত জাতীয় শব্দ করলেন।

'যা হোক, এতে কিছু এসে যায় না। আমি ওকে ভালই বাসতাম,' কথাটা এমন সুরে বলল সে যেন বাচ্চাকে ভালবাসত বউ'র উপর বিদ্বেষ থেকে।

'বাচ্চাগুলোকে খুন করেছে কে?' জিজ্ঞেস করলেন হার্পার।

'ছায়া-মানব' চট করে জবাব দিল রহমান ফয়সল। 'ছায়া-

মানব সবাইকে হত্যা করেছে। ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এসে একে একে খুন করেছে প্রত্যেককে।' মুখ ঘুরিয়ে তাকাল সে, হাসল। 'আপনি হয়তো আমাকে পাগল ঠাওরাচ্ছেন। আপনার চেহারা দেখেই তা বোঝা যায়। তবে আমি পরোয়া করি না। আমি গল্পটা শেষ করে চলে যাব।'

'বলুন, শুনছি।' বললেন হার্পার।

অয়নের বয়স তখন দুই আর শার্লি একেবারে দুধের শিশু, ওই সময় ঘটনার শুরু। রিটা ওকে ঘুমাতে নিয়ে গেছে, সাথে সাথে কাঁদতে শুরু করল অয়ন। আমাদের দুই বেডরুমের বাসা। শার্লি আমাদের ঘরে, দোলনায় ঘুমায়। ভেবেছি খিদে পেয়েছে বলে কাঁদছে অয়ন। কিন্তু রিটা বলল ওর খিদে পায়নি, এমনি চিল্লাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় থেমেও যাবে। বাচ্চাদের বেশি লাই দিতে নেই। মাথায় চড়ে বসে।

'কিন্তু অয়নের কান্না থামছিল না। আমি ওকে নিজে বিছানায় শুইয়ে দিতে লাগলাম। এবারে ও কান্নাকাটি না থামালে দেব কষে থাপ্পড়। রিটা বলল অয়ন নাকি বারবার 'আলো' বলে ফোঁপাচ্ছিল এতটুকু বাচ্চা 'আলো! আলো!' বলে চিল্লাবে কেন বুঝতে পারি না আমি। মায়েরাই শুধু বুঝতে পারে।

'রিটা মিকিমাউস টাইপের রাতের বাতির ব্যবস্থা করতে চাইল দেয়ালে এ ধরনের বাতি লাগানো হয়। আমি রাজি হলাম না। বাচ্চারা ছোট বেলায় অন্ধকারের ভয় জয় করতে না পারলে বড় হওয়ার পরেও মনের মধ্যে আতঙ্কটা গেঁথেই থাকবে।

'গ্রীষ্মে, শার্লের জন্মের পরে মারা গেল অয়ন। সে রাতে ওকে ঘুম পাড়াতে গেছি, কান্না জুড়ে দিল বাচ্চাটা। ও কী বলেছিল মনে আছে আমার। ক্লজিটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছিল, 'ছায়া-মানব। বাবা, ছায়া-মানব।'

'বাতি নিভিয়ে নিজেদের ঘরে চলে এলাম। রিটাকে জিজ্ঞেস করলাম ও এই ধরনের শব্দ একটা বাচ্চাকে কেন শেখাল। ইচ্ছে করছিল চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু সংযত করলাম নিজেকে। রিটা বলল অয়নকে সে ছায়া-মানব-টানব ধরনের কোন শব্দ শেখায়নি। ওকে আমি মিথ্যুক বলে গালাগাল দিলাম।

'গরমের ওই সময়টা খুব খারাপ কেটেছে আমার। চাকরি বলতে পেয়েছি একটা গুদামে পেপসি কোলার ট্রাক খালাস করা। প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। সারাদিনই ক্লান্ত থাকতাম। আর শার্ল প্রতিরাতে উঠে কান্নাকাটি শুরু করে দিত। রিটা বাচ্চাটাকে শান্ত করার জন্য নাকি সুরে কথা বলত। ইচ্ছে করত দুটোকেই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই। ঈশ্বর, বাচ্চারা মাঝে মাঝে এমনভাবে পাগল করে তোলে। ইচ্ছে করে খুন করে ফেলি।

'একদিন রাত তিনটের সময় বাচ্চার কান্নায় ঘুম ভেঙে গেল আমার। আমি আধা ঘুম আধা জাগরণের মাঝে বাথরুমে গেলাম। রিটা বলল অয়নকে একটু দেখে আসতে। ওকে কাজটা করতে বললাম আমি, ফিরে গেলাম বিছানায়। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় চিৎকার শুরু করল রিটা।

'উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। ঢুকলাম অয়নের ঘরে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে বাচ্চাটা। মৃত। মুখটা ময়দার মতো সাদা, সারা গা রক্তে মাখামাখি। চোখ জোড়া খোলা। বিস্ফারিত, চকচকে। পরনে ডায়াপার আর রাবারের প্যান্ট। ক'দিন ধরে বিছানা ভেজাচ্ছিল অয়ন। ওহ্, বাচ্চাটাকে ভালবাসতাম আমি।'

ফয়সল মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। মুখে ফুটল রাবারের মত ভীত হাসি। 'প্রচণ্ড চিৎকার করছিল রিটা। অয়নকে কোলে তুলে নিয়ে দোলাতে চাইছিল। বাধা দিলাম আমি। পুলিশ কোন এভিডেন্সে হাত দেওয়া পছন্দ করবে না। আমি জানি তা—

'আপনি কি তখন জানতেন ওটা ছায়া-মানবের কাজ?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন ড. হার্পার।

'না। তখন জানতাম না। তবে একটা জিনিস চোখে পড়েছিল আমার। তখন ব্যাপারটা আমার কাছে কোন অর্থ বহন না করলেও ঘটনাটা মনে ছিল।'

'কী সেটা?'

'ক্লজিটের দরজা ছিল খোলা। সামান্য। কিন্তু দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম আমি। ড্রাই-ক্লিনিং ব্যাগ ছিল ভিতরে।'

'তারপর কী হলো?'

শ্রাগ করল ফয়সল। 'ওকে কবর দিলাম।' বিষাদ নিয়ে তাকিয়ে থাকল নিজের হাতের দিকে। এ হাত ছোট ছোট তিনটে কফিনে মাটি ছুঁড়ে দিয়েছে।

'তদন্ত হয়নি?'

'অবশ্যই,' বিদ্রূপ ফয়সলের চোখে। 'স্টেথিস্কোপ গলায় এক গর্দভ এসেছিল তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে। যাক, আমরা অয়নকে কবর দেয়ার মাসখানেক বাদে ওর ঘরে শার্লকে শুতে দিলাম। রিটা রাজি ছিল না মোটেই। কিন্তু আমার মতামতই শেষ কথা। বছরখানেক কোন সমস্যা হলো না। তারপর একরাতে আমি শার্লকে দোলনায় নিয়ে যাচ্ছি, চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ছায়া-মানব, ছায়া-মানব!'

'চমকে উঠলাম ভীষণ। অয়নের মত বলছিল ও। মনে পড়ল ওর লাশ দেখার সময় ক্লজিট ডোর সামান্য ফাঁকা ছিল। শার্লকে সে রাতে নিজেদের ঘরে নিয়ে আসতে চাইলাম

'নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'না,' চেহারা বিকৃত দেখাল ফয়সলের। 'তা হলে তো রিটার কাছে স্বীকার করতে হত আমি ভুল করেছি। আমাকে কঠোর

থাকতে হয়েছে। রিটা তো একটা জেলিমাছের মত...বিয়ের আগে কতবার কত সহজে আমার সঙ্গে ও বিছানায় গেছে।'

হার্পার বললেন, 'কথাটা এভাবেও বলা যায়, আপনিও কতবার কত সহজে ওর সঙ্গে বিছানায় গেছেন।'

ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল ফয়সল। কটমট করে তাকাল হার্পারের দিকে।

'নিজেকে খুব পণ্ডিত ভাবছেন?'

'অবশ্যই না,' বললেন ডাক্তার।

'তা হলে আমাকে নিজের মত করে কথা বলতে দিন।' ধমক দিল ফয়সল। 'আমি এখানে এসেছি গল্পটা বলে বুক হালকা করার জন্য। আপনি মনে মনে চাইলেও আমার সেক্স লাইফ নিয়ে কোন কথা বলব না। রিটা আর আমার যৌন জীবন খুব সাধারণ, এর মধ্যে কোন নোংরামি নেই। আমি জানি কেউ কেউ এ নিয়ে কথা বলতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু আমি তাদের মত নই

'আচ্ছা,' বললেন হার্পার।

'আচ্ছা,' অস্বস্তি নিয়ে কথাটার প্রতিধ্বনি তুলল ফয়সল ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেছে। ক্লজিট ডোরের দিকে ঘুরে গেল অস্থির চোখ ওটা বন্ধ।

'দরজাটা খুলে দেব?' জিজ্ঞেস করলেন হার্পার।

'না,' দ্রুত বলল ফয়সল। হাসল নার্ভাস ভঙ্গিতে। 'আপনার ক্লজিট দেখে আমি কী করব?

'ছায়া-মানব ওকেও ধরল,' বলল ফয়সল। কপালে হাত ঘষল যেন স্মৃতিচারণের চেষ্টা করছে। 'মাসখানেক পরে। কিন্তু তার আগে একটা ঘটনা ঘটল। একরাতে শার্লের ঘর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম-আমি। চিৎকার করছে মেয়েটা। চট করে খুলে ফেললাম দরজা–হলঘরের বাতি জ্বালানোই ছিল–আর...বাচ্চাটা

দোলনায় উঠে বসে কাঁদছিল এবং...কিছু একটা নড়াচড়া করছিল।' ক্লজিটের পাশে, ছায়ায়। গড়াচ্ছিল।'

'ক্লজিটের দরজা কি খোলা ছিল?'

'সামান্য।' ঠোঁট চাটল ফয়সল। 'ছায়া-মানব বলে চিৎকার করছিল শার্ল। থাবা বা এ জাতীয় কিছু একটা শব্দ উচ্চারণ করছিল ঠিক বুঝিনি আমি। তবে পরে মনে হয়েছে ওটা "থাবা"ই বলেছিল মেয়েটা। লম্বা থাবা।' গলা বসে গেল ফয়সলের, ফিসফিসে শোনাল।

'ক্লজিটে চোখ বুলিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।' বুকের উপর শক্তভাবে মুঠি ভাঁজ করে রেখেছে ফয়সল। সাদা হয়ে আছে আঙুলের গাঁট।

'কিছু কি ছিল ওখানে? আপনি কী দেখেছেন–'

'আমি কিছুই দেখিনি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ফয়সল। ছিপি খোলা বোতলের মত আত্মার তল থেকে হড়হড়িয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো, 'ওকে মৃত অবস্থায় দেখেছি আমি। সমস্ত শরীর কালো হয়ে গিয়েছিল মেয়েটার। জিভ উল্টে ঢুকে গিয়েছিল গলার ভিতরে। ওর চোখ যেন স্টাফ করা প্রাণীর মত, চকচকে, বীভৎস, জ্যান্ত মার্বেলের মত। যেন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, 'ড্যাডি তোমার জন্য ও আমাকে মেরেছে। তুমি আমাকে খুন করেছ, বাবা, তোমার কারণে আমি মারা গেছি... গলার স্বর বুজে এল ফয়সলের। বড়সড় এক ফোঁটা অশ্রু চোখ থেকে ঝরল, নামল গাল বেয়ে।

'হার্ট ফোর্ড রিসিভিং-এ শার্লের অটোপসি করা হলো। ওরা বলল, মস্তিষ্কে খিঁচুনি হয়েছিল বাচ্চাটার। খিঁচুনির কারণে জিভ ঢুকে যায় গলায়। একা বাড়ি ফিরলাম আমি। রিটাকে বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হলো। কিছুই চিনতে পারছিল না ও তাই

একাই ফিরতে হলো বাড়ি। স্রেফ মস্তিষ্কের খিঁচুনির কারণে আমার মেয়েটা মরে গেছে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভয় পেলেও বাচ্চারা খিঁচুনির শিকার হতে পারে। আমি ফিরে এলাম বাড়িতে যেখানে ওটা ছিল।'

ফিসফিস করল সে। 'কাউচে ঘুমালাম আমি। বাতি জ্বালিয়ে রেখে।'

'কিছু ঘটেছিল কি?'

'স্বপ্ন দেখেছিলাম,' বলল ফয়সল। 'দেখলাম একটা অন্ধকার ঘর, ঘরে কিছু একটা আছে...ক্লজিটের ভিতরে, আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছিলাম না। ওটা শব্দ করছিল...হিসহিসে একটা আওয়াজ। কমিক বই টেলস ফ্রম দা ক্রিপ্ট-এর কথা মনে পড়ে গেল আমার। গ্রাহাম ইঙ্গলস নামে এক লোক ছিল। সে ভয়ঙ্কর সব ছবি আঁকত। একটা গল্পে আছে এক মহিলা তার স্বামীর পায়ে পাথর বেঁধে তাকে ডুবিয়ে মারে। লোকটা ফিরে আসে। তার একটা চোখ মাছে খেয়ে ফেলেছিল, মাথা ভর্তি সবুজ শ্যাওলা। সে তার স্ত্রীকে খুন করে। আমি মাঝরাতে দুঃস্বপ্নটা দেখে জেগে উঠি, মনে হচ্ছিল পিশাচটা আমার উপর ঝুঁকে আছে। থাবা বাগিয়ে....লম্বা থাবা...'

ডেস্কে আটকানো ডিজিটাল ঘড়িটির দিকে তাকালেন ড. হার্পার। প্রায় আধঘণ্টা ধরে কথা বলছে রহমান ফয়সল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্ত্রী বাড়ি ফেরার পরে আপনার প্রতি তাঁর আচরণ কীরকম ছিল?'

'সে আমাকে তখনও ভালবাসত,' গর্বের গলায় জবাব দিল ফয়সল। 'আমি ওকে যা বলতাম তা-ই করত। স্ত্রীরা তো তা-ই করবে, তাই না? স্বামীর কথা মত চলবে। আমেরিকান মেয়েরা বাঙালি স্বামীদের ওপর কর্তৃত্ব দেখায়। কিন্তু রিটাকে আমি সে

সুযোগ কখনোই দেইনি। যাক, যা বলছিলাম–রিটা প্রথম চার পাঁচ মাস খুবই মনমরা হয়ে ছিল। হাসত না, টিভি দেখত না জানতাম শোকটা সামলে উঠতে পারবে ও।

'আরেকটি সান্তান চাইছিল রিটা।' অন্ধকার মুখে যোগ করল সে। 'আমি মত দেইনি। বলেছি এখনই আবার সন্তান নেয়ার দরকার নেই। বলেছি আমরা অন্তত কিছুদ্দিন জীবনটাকে উপভোগ করে নেব। যেটা আগে সম্ভব হয়নি। আমাদের বিয়ের পরপরই জন্ম হয় অয়নের। ওকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে রিটাকে। অন্য কোনদিকে তাকানোর সময় পায়নি। আমি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দিলাম ওকে। রিটার ডাক্তার ওকে আই ইউ ডি দিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। পরের বছর আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ল রিটা।'

'কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিখুঁত নয়,' বললেন হার্পার। 'বড়ি আটানব্বই ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে। আই ইউডিও পারফেক্ট নয়। তো তারপর কী হলো?'

'শার্ল যে বছর মারা গেল ওই বছরেই শেষের দিকে আবার মা হলো রিটা। এবার ছেলে। আমি তার নাম রাখলাম শিহাব ফয়সল। আমার মতই চেহারা পেয়েছিল বাচ্চাটা। অয়ন দেখতে ছিল তার মায়ের মত। শার্লের সঙ্গে কারও মিল ছিল না। তবে শিহাব ছিল হুবহু আমার মত দেখতে।

'কাজ থেকে ফিরে আসার পরে ওর সঙ্গে খেলা করতাম আমি। আমার আঙুল মুঠিতে চেপে ধরে হাসত ও আর গলা দিয়ে গকগক শব্দ করত। নয় হপ্তা বয়সী বাচ্চা তার বুড়ো বাপের দিকে তাকিয়ে হাসছে। ভাবা যায়?'

'তবে বুঝতে পারছিলাম বাচ্চাটাকে আমি অসম্ভব ভালবাসি। আমি তখন একটা ভাল চাকরি পেয়েছি, ক্লুয়েট অ্যান্ড সন্সের জন্য

ড্রিলিং-এর জিনিসপত্র বিক্রি করার কাজ। বেশ ভালই করছিলাম আমি। আমরা চলে আসি ওয়াটারবারিতে। চমৎকার কেটে যাচ্ছিল দিন। কিন্তু তারপর খারাপ সময় শুরু হয়ে গেল।

'গত বছর থেকে শুরু হলো দুর্দিন। ওই বাড়ির মধ্যে কীরকম যেন একটা পরিবর্তন ঘটছে টের পাচ্ছিলাম। হলঘরে জুতা রাখতাম ক্লজিট খুলতে ভয় লাগত বলে। ভাবতাম ওটা ওর মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে। দরজা খোলা মাত্র হামলে পড়বে আমার ওপর। মনে হতো হিসহিসে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছি আমি। যেন ভিতরে সবুজ, কালো এবং ভেজা কিছু একটা লুকিয়ে আছে।

'রিটা জিজ্ঞেস করছিল আমার কাজের চাপ খুব বেশি বেড়ে গেছে কিনা। ওকে ধমকে উঠলাম, আগের মত। ওদেরকে বাড়িতে একা রেখে যেতে ভয় লাগত আমার। তবে বাইরে গেলে স্বস্তিও পেতাম। অবশ্য সেইসঙ্গে এমনও ভাবতাম আমরা নতুন বাড়িতে চলে আসার পরে ওটা হয়তো আমাদের খোঁজ পায়নি। রাতের বেলায় রাস্তার আর ড্রেনের পাইপে খুঁজেছে। আমাদের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছে। কিন্তু একবছর পরে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার ফিরে এসেছে ওটা। ওটা আমাকে আর শিহাবকে চায়। কোনকিছু নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করলে অবাস্তব জিনিসেরও বাস্তবে রূপান্তর ঘটে।'

'আপনি কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন, মিস্টার ফয়সল।'

অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকল ফয়সল। তারপর শুরু করল, 'শিহাব ফেব্রুয়ারিতে মারা গেল। রিটা তখন বাসায় ছিল না। ওর বাবার ফোন পেয়ে নিজের বাড়ি চলে যায়। ওর মা গাড়ি চাপা পড়েছিলেন। মারা যাননি। তবে টানা দুই মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তাঁকে। এই দুই মাস তার মা'র সঙ্গে ছিল রিটা। শিহাবকে দেখা শোনার জন্য এক মহিলাকে রেখে দিয়েছিলাম।

মহিলা খুব যত্ন নিত শিহাবের। আমরা রাতের বেলা ক্লজিটের দরজা বন্ধ রাখতাম। সকালে উঠে দেখতাম খোলা।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ফয়সল। 'শিহাবকে নিয়ে আমি ঘুমাতাম। শার্ল আর অয়নের মৃত্যুর পরে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই শিহাবকে কাছ ছাড়া করতে চাইনি।'

'কিন্তু করেছিলেন তো?' জিজ্ঞেস করলেন ড. হার্পার।

'হুঁ,' বলল ফয়সল। ম্লান হাসি ফুটল মুখে। 'করেছিলাম।'

আবার নেমে এল নীরবতা। তারপর হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো ফয়সল, 'হ্যাঁ, করেছিলাম, বাধ্য হয়েছিলাম কাজটা করতে। একরাতে বাড়ির সবগুলো দরজা খুলে যায়। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি হলঘরে কোট ক্লজিট থেকে সদর দরজা পর্যন্ত নোংরা মাটিতে সয়লাব। ওটা কি বাইরে যাচ্ছে? আবার ভিতরে আসছে? জানি না। আর শব্দ হত...

মাথার চুল হাত দিয়ে চেপে ধরল ফয়সল। 'রাত তিনটায় ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধকারে তাকিয়ে প্রথমে হয়তো আপনার মনে হবে ঘড়ির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু ঘড়ির শব্দ নয় ওটা। কিছু একটা পা টেনে টেনে চলার শব্দ। অথবা খসখসে আওয়াজ, যেন সিঁড়িতে নখ দিয়ে কেউ আঁচড় কাটছে। এ শব্দ আপনার আত্মা উড়িয়ে দেবে।' কাঁপছে ফয়সল।

'শব্দ আর সহ্য হচ্ছিল না আমার। তাই শিহাবকে অন্যঘরে রেখে এলাম। জানতাম ওটা শিহাবের জন্য আসছে কারণ শিহাব দুর্বল। প্রথম দিনই মাঝরাতে বিকট চিৎকার করে উঠল ও। আমি ওর ঘরে গিয়ে দেখলাম বিছানার উপর উঠে চিৎকার করছে শিহাব, 'বাবা, ছায়া-মানব, বাবা, ছায়া-মানব...আমাকে নিয়ে যাও... আমাকে নিয়ে যাও।' ফয়সলের কণ্ঠ বাচ্চাদের মত উচ্চকিত হয়ে উঠল চোখ বিস্ফারিত, যেন পুরো মুখটাকে দখল করেছে চোখ

জোড়া। কাউচের একেবারে কিনারে গিয়ে সেঁধিয়েছে সে।

'কিন্তু আমি ওকে নিয়ে আসতে পারিনি,' গলার কম্পন এখনও যায়নি ফয়সলের। 'এক ঘণ্টা পরে আবার চিৎকার। ভয়ঙ্কর চিৎকার। আমি এক দৌড়ে ছুটে গেলাম ওর কাছে। এমনকী বাতি পুর্যন্ত জ্বালানোর সময় পাইনি। গিয়ে দেখি...ওহ, মাই গড, ওটা ওকে ধরেছে। ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকাচ্ছে। আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম মট করে একটা শব্দ। ঘাড় ভেঙে গেল শিহাবের।'

'তারপর কী হলো?'

'আমি ছুটে পালিয়ে এলাম ওখান থেকে।' ঠাণ্ডা আর মরা শোনাল ফয়সলের কণ্ঠ। 'কাপুরুষের মত দৌড়ে পালালাম। একটা দোকানে ঢুকে ছয় কাপ কফি খেলাম। তারপর বাড়ি ফিরলাম। ততক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। দোতলায় ওঠার আগে ফোন করলাম পুলিশে। শিহাব মেঝেতে পড়ে ছিল, চোখ খোলা। আমার দিকে যেন কটমট করে তাকিয়ে ছিল। যেন অভিশাপ দিচ্ছে। ওর এক কানে রক্ত। মাত্র এক ফোঁটা। ক্লজিটের দরজা খোলা—সামান্য ফাঁক করা।'

থামল ফয়সল। হার্পার তাকালেন ঘড়ির দিকে। পঞ্চাশ মিনিট পার হয়েছে।

'নার্সের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন,' বললেন তিনি। 'মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার। ঠিক আছে?'

'আমি শুধু আমার গল্পটা বলতে এসেছিলাম,' বলল ফয়সল। 'আমার বুকটা হালকা করার জন্যে। আমি পুলিশের কাছে মিথ্যা বলেছি, বলেছি বাচ্চাটা হয়তো দোলনা থেকে নামতে গিয়ে ঘাড় ভেঙেছে। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করেছে করারই কথা। অমনই মনে হয়েছিল কিন্তু রিটা জানত। রিটা অবশেষে... জানতে পারে...

ডান হাত দিয়ে চোখ ঢাকল সে, কাঁদতে শুরু করল।

'মিস্টার ফয়সল, এ নিয়ে আরও কথা বলা দরকার,' বললেন ড. হার্পার। 'আমরা হয়তো আপনাকে অপরাধবোধ থেকে কিছুটা মুক্তি দিতে পারব। তবে আগে এ ব্যাপারটা আপনার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

'আমার কথা আপনার বিশ্বাস হয়নি?' আর্তনাদ করে উঠল ফয়সল। চোখের উপর থেকে হাত নামাল। লাল টকটকে চোখ।

'এখনও নয়,' শান্ত গলায় বললেন ড. হার্পার। 'মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবার, ঠিক আছে? নার্সের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন। হ্যাভ আ গুড ডে।'

ফ্যাকাসে হাসল ফয়সল, অফিস থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল, পিছন ফিরে তাকাল না একবারও।

নার্সের ঘরে কেউ নেই। ডেস্কে একটা সাইনবোর্ড খাড়া করা: আসছি এখুনি।

ফয়সল হার্পারের অফিসে ফিরে এল। 'ডাক্তার, আপনার নার্স—

ঘরে কেউ নেই।

তবে ক্লজিটের দরজা খোলা। সামান্য ফাঁক করা

'বেশ,' ক্লজিট থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'বেশ।' যেন আগাছা মুখে পুরে কেউ বিকৃত সুরে শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছে। জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ফয়সল, ক্লজিট ডোরটাকে পুরোপুরি খুলে যেতে দেখে। টের পেল উরু বেয়ে গরম, তরল একটা পদার্থ পড়ছে।

'বেশ,' ক্লজিট থেকে নেমে এল ছায়া-মানব।

তার পচা, কোদালের মত নখঅলা একটা হাতে ধরে রেখেছে ড. হার্পারের মুখোশ।

প্রত্যাবর্তন

লন্ডনে মিসেস ড্রোভারের আজ শেষ দিন। তাই অবরুদ্ধ বাড়িটিতে এসেছেন নিজের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। কিছু জিনিস তাঁর নিজের, কিছু পরিবারের। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এখন গ্রামের বাড়িতে।

আগস্টের শেষাশেষি। সারা দিন আজ থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। বিকেলের হলুদ আলোতে পেভমেন্টের পাশের গাছের পাতা ঝলমল করছে। আকাশের এক কোণে জমতে শুরু করেছে কালো মেঘ, সম্ভবত আবারও বৃষ্টি নামবে।

সে রাস্তা ধরে বাড়িতে ঢুকেছেন মিসেস ড্রোভার, একসময় এখানে নিত্য পদচারণা ছিল তাঁর। বহু বছর পর আবার এসেছেন পরিত্যক্ত বাড়িটিতে। তবে পরিত্যক্ত বলতে একজন পার্ট টাইম কেয়ারটেকার বাড়িটির দেখা শোনা করে। সে আজ বাসায় নেই। দরজা ভেজানো ছিল, খুলতেই বোঁদা গন্ধ নিয়ে হাওয়া ধাক্কা দিয়েছে মিসেস ড্রোভারকে। বড় জানালাটি খুলে দিলেন আলো বাতাসের জন্য।

বাড়ির সবকিছু আগের মতই আছে। সাদা মার্বেল পাথরের ম্যান্টল পিস, লেখার টেবিলের ওপর সেই ফ্লাওয়ার ভাসটা আগের মতই আছে; ওয়াল-পেপারের দাগগুলো এখনও অম্লান। তেমন ধুলোটুলো পড়েনি কোনটিতেই। ভেন্টিলেশন বলতে সেই

চিমনিটা আগের মতই আছে। ড্রইংরুমটাকে ঠাণ্ডা উনুনের মত মনে হলো মিসেস ড্রোভারের। টেবিলের ওপর পার্সেলগুলো রাখলেন তিনি, পা বাড়ালেন সিঁড়ির দিকে; তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেডরুমের সিন্দুকে।

পার্টটাইম কেয়ারটেকার গেছে ছুটিতে, আজও ফেরেনি। তবে লোকটা যে তাঁর বাড়ির যত্ন টত্ন তেমন নেয় না দেখেই বোঝা যায়। দেয়ালের কয়েক জায়গায় ফাটল, সর্বশেষ বোমা বর্ষণের চিহ্ন।

হলঘরে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। ওদিক দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিসেস ড্রোভার। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন টেবিলের দিকে। একটা চিঠি। খামের ওপর তাঁর নাম লেখা।

মিসেস ড্রোভার প্রথমেই ভাবলেন কেয়ারটেকার লোকটা হয়তো এসেছিল, চিঠিটি রেখে গেছে। অবশ্য কেয়ারটেকার জানে না যে তিনি লন্ডনে আসবেন। সে চিঠিটি তাঁর নামে পোস্ট করতে পারত। তা না করে গাফিলতির চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ধুলোর মধ্যে চিঠিটি ফেলে রেখেছে। চরম বিরক্ত হলেন মিসেস ড্রোভার। খামটি তুলে নিলেন। খামের ওপর কোন ডাক টিকেট নেই। ওটা নিয়ে সোজা দোতলায় চলে এলেন তিনি, বেডরুমে। ঘরটা বাগানের দিকে মুখ ফেরানো। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা বেড়ে গেছে আরও, রীতিমত অন্ধকার হয়ে আসছে। আলো জ্বাললেন মিসেস ড্রোভার। তারপর খামের মুখ ছিঁড়ে বের করলেন চিরকুট। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। তিনি পড়তে শুরু করলেন:

প্রিয় ক্যাথেলিন,

তুমি নিশ্চয়ই জান আজ আমাদের অ্যানিভার্সারী ডে।

বছরগুলো পেরিয়ে গেছে কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর গতিতে। তবু মনে হয় কিছুই বদলায়নি। তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, সে বিশ্বাস আমার ছিল। তুমি লন্ডন ছেড়ে চলে গেলে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, তবে ঠিক সময়ে ফিরে এসেছ বলে খুশিও হয়েছি। তোমার সাথে আমার দেখা হবে নির্ধারিত সময়েই।

ততক্ষণ পর্যন্ত...

কে.

তারিখটা লক্ষ করলেন মিসেস ড্রোভার। আজকের তারিখ। বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেললেন তিনি চিঠিটি, তারপর আবার তুলে নিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রসাধনী চর্চিত ওষ্ঠযুগল সাদা হয়ে গেল। টের পেলেন চেহারায় ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ, মাথার হ্যাটটা অবহেলায় কপালের ওপর টানা, গালে পাউডার বোলাতে ভুলে গিয়েছিলেন। সরু গলায় স্বামীর দেয়া মুক্তোর হার ঝুলছে, গলাটা বেশি চিকন লাগছে। পরনে গোলাপি রঙের উলেন জাম্পার, তাঁর বোনের দেয়া। সহজে ভেঙে পড়ার পাত্রী তিনি নন। তবে চিঠিটি তাঁকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে। আয়নায় নিজের উদ্বিগ্ন চেহারা দেখতে পাচ্ছেন মিসেস ড্রোভার। আয়নার সামনে থেকে সরে এলেন তিনি, সিন্দুকটার দিকে এগোলেন। ওটার ভেতরেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে। সিন্দুক খুলে জিনিসগুলো খুঁজছেন, আবার দৃষ্টি চলে গেল চিঠিটির দিকে। হঠাৎ গির্জার ঘড়ি ঢং ঢং শব্দে দু'টো বাজার কথা ঘোষণা করল। এদিকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আঁতকে উঠলেন মিসেস ড্রোভার। 'নির্ধারিত সময়...মাই গড,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'কীসের নির্ধারিত সময়? কিন্তু আমি কীভাবে...? পঁচিশ বছর পর...

*

পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। ক্যাথেলিন নামের এক তরুণী প্রেমে পড়ে যায় এক তরুণ সৈনিকের। তখন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ চলছে। এক সন্ধ্যায় প্রেমিকটি বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল তার প্রেমিকার কাছ থেকে। বলছিল, 'আবার ফিরে আসব আমি। আজ হোক, কাল হোক। তোমার সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে আমার। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।'

কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। অপেক্ষা করেছিল ক্যাথেলিন। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও প্রেমিকের দেখা না পেয়ে পরিবারের চাপে বিয়ে করে সে জনৈক উইলিয়াম ড্রোভারকে। ক্যাথেলিন হয়ে যায় মিসেস ড্রোভার। কেনসিংটনের নির্জন এই বাড়িতে এক সময় সুখের সংসার গড়ে তোলে ওরা। সন্তানের মুখ দেখে। ছেলেমেয়েরা এখানেই বড় হয়েছে। তারপর শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সবাই পালিয়ে গেল গ্রামে, বোমার ভয়ে। তারপর আর ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেনি কেউ যুদ্ধবিধ্বস্ত পুরনো বাড়িতে।

...আবার বাস্তবে ফিরে এলেন মিসেস ড্রোভার। চোখ বুজে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। চিঠিটিকে অস্বীকার করতে চাইল মন ভাবতে চাইলেন ওটা স্রেফ কল্পনা। কিন্তু চোখ মেলে চাইতেই ওটাকে বিছানার ওপর দেখতে পেলেন তিনি।

চিঠিটি পাঠিয়ে কেউ তাঁকে ভয় দেখাতে চেয়েছে। কে সে? কারও তো জানার কথা নয় আজ তিনি এ বাড়িতে আসবেন। কেয়ারটেকার যদি আজ বাসায় আসত, সেও নিশ্চয়ই আশা করত না মিসেস ড্রোভারকে। সেক্ষেত্রে চিঠিটি সে ডাকঘরে নিয়ে মিসেস ড্রোভারকে পোস্ট করে দিত। তবে কেয়ারটেকার যে

আসেনি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তা হলে চিঠিটি হলঘরে এল কী করে? ওটার তো পা বা পাখা নেই যে হেঁটে বা উড়ে এসে টেবিলে বসে থাকবে। নিশ্চয়ই ওটাকে কেউ নিয়ে এসেছে-কিন্তু কেয়ারটেকার ছাড়া আর কারও কাছে চাবি থাকে না। অবশ্য চাবি ছাড়াও ঘরে ঢোকা যায়, এ চিন্তাটা আসতে মন খচখচ করতে লাগল। এর মানে এটাই হতে পারে—তিনি আর একা নন। নীচতলায় অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে চিঠির মালিকের জন্যে। অপেক্ষা করতে হবে—কতক্ষণ? যতক্ষণ না 'নির্ধারিত সময়' আসে। তবে সে সময়টা বোধহয় ছ'টা নয়—ছ'টা তো বেজেই গেছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ড্রোভার, দরজা বন্ধ করলেন।

এখান থেকে যেতে হবে তাঁকে। ট্রেন ধরতে হবে। আগে ট্যাক্সি ডাকা দরকার। কারণ এত মালামাল নিয়ে হেঁটে রেল স্টেশনে যাওয়া সম্ভব নয়। মনে মনে আওড়ালেন মিসেস ড্রোভার: আমি এখন ফোন করে ট্যাক্সি ডাকব। ট্যাক্সি হয়তো সাথে সাথে আসতে পারবে না। তবে ট্যাক্সির সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত হলঘরে পায়চারি করে বেড়াব।'

কিন্তু ফোন করতে গিয়ে দেখলেন লাইন কাটা। ঘাম ফুটল মিসেস ড্রোভারের কপালে। বিচলিত বোধ করছেন।

আমি কেন ওর কথা ভাবব, ভাবলেন তিনি। ও তো কখনও আমার প্রতি সদয় ছিল না। মা বলত আমাকে সে কখনোই ভালবাসেনি। সে তার প্রয়োজনে আমাকে ব্যবহার করেছে—ওটাকে ভালবাসা বলে না। আমাকে দিয়ে সে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিল কি? আমার ঠিক মনে পড়ছে না—কিন্তু ঠিকই মনে পড়ছিল তাঁর। তবে মনে পড়লেও তিনি ভুলে থাকতে

চাইলেন সেই মুখখানা। সিদ্ধান্ত নিলেন এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বেন। ঘর থেকে ক'পা এগুলেই একটা স্কোয়ার। ওটা মিশেছে মূল রাস্তার সাথে। রাস্তায় নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। আর একবার ট্যাক্সিতে উঠতে পারলে তাঁর আর ভয় করবে না।

দরজা খুললেন মিসেস ড্রোভার, সিঁড়ির ধারে দাঁড়ালেন, কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছেন।

কিছুই শুনতে পেলেন না তিনি, শুধু এক পশলা শুকনো হাওয়া ঝাপটা মেরে গেল মুখে। শিউরে উঠলেন তিনি। বাতাসটা এসেছে বেযমেন্ট থেকে: কেউ হয়তো ওখানকার কোন দরজা বা জানালা খুলেছে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে।

থেমে গেছে বৃষ্টি, চকচক করছে পেভমেন্ট। সদর দরজা দিয়ে সাবধানে শূন্য রাস্তায় পা রাখলেন মিসেস ড্রোভার। বিপরীত দিকের বাড়িগুলোতেও লোকজন থাকে না, খাঁ খাঁ করছে, ভাঙা কাঠামো নিয়ে যেন কটমট করে তাকিয়ে থাকল মিসেস ড্রোভারের দিকে।

সামনে পা বাড়ালেন তিনি, পেছন ফিরে তাকাবেন না পণ করেছেন। রাস্তাটা এমন নির্জন, ছমছম করে উঠল গা যুদ্ধের ভয়ে সবাই পালিয়েছে। স্কোয়ারের শেষ মাথা। যেখানে মিলেছে চৌরাস্তার সাথে, দুটো বাস দেখলেন মিসেস ড্রোভার। পাল্লা দিয়ে ছুটছে। রাস্তায় লোকজন দেখা গেল। জীবনের চিহ্ন। ফোঁস করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি। চৌরাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, তবে একটা মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত, লাফ মেরে উঠে পড়লেন মিসেস ড্রোভার। ঠিক তখন গির্জার ঘড়িতে সাতটা বাজার ঘণ্টা ধ্বনি শোনা গেল। মেইন স্ট্রিটের দিকে মুখ করে ছিল ট্যাক্সিটা, তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হলে ঘুরতে হবে-কিন্তু মিসেস ড্রোভার কিছু বলার আগেই

চলতে শুরু করল যন্ত্রযান। যাত্রী আর ড্রাইভারকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে যে গ্লাস প্যানেলটা ওটার ওপর ঝুঁকলেন বিরক্ত ড্রোভার, অধৈর্য ভঙ্গিতে টোকা দিয়ে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

প্রায় সাথে সাথে ব্রেক কষল ড্রাইভার, মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। যাত্রী এবং ড্রাইভারের মাঝে বাধা সৃষ্টি করে থাকল গ্লাস প্যানেল, তবে ওরা পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, চোখে চোখে চেয়ে আছে।

মিসেস ড্রোভারের মুখ হাঁ হয়ে গেল, চিৎকার দিতে যাচ্ছেন। গ্লাসের অপর দিকে হিমশীতল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তাঁর প্রেমিক, যে মারা গেছে বলেই জানেন মিসেস ড্রোভার।

মিসেস ড্রোভার গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিচ্ছেন, মুখ ঘোরাল ড্রাইভার, ফুল স্পিডে ছুটল ট্যাক্সি। তবে মেইন স্ট্রিটের দিকে নয়। কেনসিংটনে মিসেস ড্রোভারের পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে। রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে একটা গভীর খাদে, সেদিকেই তীর বেগে ছুটছে ট্যাক্সি।

ভুতুড়ে বাড়ি

রাত দুটো। লন্ডন। টম এবং ডেভ রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ভবঘুরের মত। বেশ কয়েকটা হোটেলে ওঠার চেষ্টা করেছিল। মেলেনি জায়গা। শহরের সরু রাস্তায় ওদের পায়ের প্রতিধ্বনি ছাড়া এ মুহূর্তে কোনও শব্দ নেই।

'কী কুয়াশারে বাবা!' বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ডেভ। 'এজন্যই এ শহরটাকে দু'চক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে না। যখন তখন কুয়াশা পড়ে।' গত এক ঘণ্টায় কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে। গাঢ় চাদর ভেদ করে হোটেলের নিয়ন সাইনও প্রায় পড়া যাচ্ছে না। রাস্তায় ট্রাফিক বাতিও গ্রাস করেছে প্রবল কুয়াশা। কিছুই চেনা যায় না।

'শুয়ে পড়ার কোনও জায়গা আমার চাই-ই,' গুঙিয়ে উঠল টম। 'শরীর আর চলে না।'

কিন্তু ঘুমাবার মত কোনও জায়গা চোখে পড়ছে না। ওরা পিকাডিলি সার্কাস থেকে হেঁটে গ্রীন পার্কে এল। তারপর উত্তরে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পা বাড়াল। একটা গলিতে ঢুকে পড়ল দু'বন্ধু। এ গলির দু'পাশে বড় বড় চারতলা, জরাজীর্ণ কয়েকটি ভবন। হঠাৎ সাইন বোর্ডটি চোখে পড়ল। একটি ভবনের সামনের লোহার কালো গেটে ঝুলছে সাইনবোর্ড–

'বিক্রি হবে।'

'দেখে মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কেউ থাকে না,' মন্তব্য করল টম। 'একটা কাজ করি, চল। আজ রাতটা এ বাড়িতেই কাটিয়ে দিই।'

'ঘুমাবার মত জায়গা পেলেই হলো,' বলল ডেভ।

লোহার গেটের মাথায় উঁচু উঁচু লম্বা, ধারাল শিক। দুই বন্ধু সাবধানে উঠে পড়ল গেটে, লোহার ক্রসবারে পা রেখে সতর্কতার সঙ্গে ডিঙাল শিক।

গেট পার হয়ে পা টিপে টিপে ভবনটির দিকে এগোল ওরা। একটা জানালায় আলো জ্বলছে। ভেতরে কেউ নেই।

'যা ভেবেছি,' ফিসফিস করল টম। 'খালি।'

'হুঁ,' বলল ডেভ। 'কিন্তু ভেতরে ঢুকব কী করে?'

পকেট হাতড়ে সুইস আর্মি নাইফ বের করল টম। ছুরির ডগা জানালার পেতলের লকে ঢুকিয়ে মোচড় দিল। তারপর ধাক্কা দিতেই খুলে গেল জানালা। ডেভের দিকে ফিরে সন্তুষ্টির হাসি উপহার দিল টম।

দুই তরুণ জানালা টপকে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'এখানে ঘুমানো যাবে না,' চারপাশে চোখ বুলাল ডেভ।

'ঘরভর্তি পেরেক আর হাবিজাবি যন্ত্রপাতি। এতকিছু পরিষ্কার করতে পারব না।'

'ঠিক আছে। অন্য ঘরগুলোয় উঁকি দেয়া যাক।' পরামর্শ দিল টম।

পুরানো বাড়িটির হলওয়েতে ঢুকল ওরা। নড়বড়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। টম সিঁড়ি বাইতে লাগল, পেছন পেছন ডেভ। দোতলায় চলে এল দু'জনে। কিন্তু এদিকের সবগুলো ঘরে তালা। তিনতলায় উঠে এল ওরা। একই অবস্থা। একটিও ঘর খোলা নেই। প্রতিটি দরজা তালা বন্ধ।

'আরেকটা তালা বাকি আছে মনে হচ্ছে,' সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বলল টম। 'চলো তো দেখি।'

বাড়ির সর্বশেষ সিঁড়ির ধাপ বাইল ওরা। ডেভের পা আর চলছে না। ঘুম এবং ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর।

টপ ল্যান্ডিং-এ একটি মাত্র দরজা। চারপাশে ঢালু হয়ে আছে ছাদ। ডোর নবে মোচড় দিল টম। ওকে স্বস্তি দিয়ে খুলে গেল কবাট।

ছোট ঘরটিতে ঢুকে পড়ল দুই বন্ধু। এক জোড়া খাট এবং একটি ড্রেসার দেখতে পেল। ঘরে একটি মাত্র জানালা, রাস্তার দিকে।

'মন্দ নয়,' মন্তব্য করল টম। ঘরের এক কোণে একটি স্ট্যান্ডে মোমবাতিও আছে। ওটা জ্বালাল টম। ডেভ পুরানো খাটে ধপাশ করে শুয়ে পড়ল।

এমন সময় ওদের নীচে, সিঁড়িতে দুড়ুম করে একটা শব্দ হলো।

লাফিয়ে উঠল ডেভ। 'কীসের শব্দ?'

পা টিপেটিপে হলওয়েতে চলে এল টম। দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত। তারপর ফিরল ঘরে।

'আমরা যে জানালা দিয়ে এ বিল্ডিং-এ ঢুকেছি সম্ভবত ওটা বাতাসের চাপে বন্ধ হয়ে গেছে।'

'তা হতে পারে,' সায় দিল ডেভ। খাটের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসল। 'তবে জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না। কেমন গা ছমছমে।'

'আরে রাখ,' দাবড়ে উঠল টম। 'ঘুমাবার যে জায়গা পাওয়া গেছে এই-ই ঢের।'

ওরা দু'জন দুই বিছানায় শুয়ে পড়ল। একটা সিগারেট ধরাল

টম। ফুঁ দিয়ে নেভাল মোমবাতি। আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে ভেসে এল খলখল হাসির শব্দ।

'তুই হাসছিস নাকি, টম?' জিজ্ঞেস করল ডেভ, উঠে বসেছে বিছানায়।

'না,' অস্বস্তি নিয়ে জবাব দিল টম। 'ছাদ থেকে শব্দটা এসেছে মনে হলো।'

'এখানে থাকা বোধহয় ঠিক হবে না, কী বলিস?' জানতে চাইল ডেভ।

পাশ ফিরে শুলো টম। 'কিন্তু এত রাতে কই যাবি?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল দু'বন্ধু।

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাড়িটা ভুতুড়ে,' অন্ধকারে ভেসে এল ডেভের কণ্ঠ।

'চুপ করে ঘুমা তো।'

চুপ হয়ে গেল ডেভ। হঠাৎ আরেকটা শব্দ ভেঙে দিল রাতের নিস্তব্ধতা। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। দ্রুত ওপরে উঠে আসছে কেউ। তবে হেঁটে নয়, গড়িয়ে গড়িয়ে যেন কেউ সিঁড়ির ধাপ বাইছে।

'এখানে আমি আর থাকব না,' ডেভের কণ্ঠে আতঙ্ক।

'তা হলে চল বেরিয়ে পড়ি।' বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল টম। মোম জ্বালল।

ঠিক তখন, নীচতলার দরজায় কেউ ধাক্কাতে শুরু করল। ওই দরজা বন্ধ দেখে এসেছে ওরা। একই সঙ্গে খলখলে ভৌতিক হাসিটা ভেসে এল আবার। এবারে হলওয়ে থেকে।

'বাইরে যেতে ভয় লাগছে,' বলল ডেভ। মুখ শুকিয়ে আমসি।

'বাইরে না যাওয়াই ভাল,' সায় দিল টম। দরজার সামনে হেঁটে গেল ও। লোহার ছিটকিনি টেনে দিল।

'বাইরে যে-ই থাকুক আর ঢুকতে পারবে না এ ঘরে।'

নিজের বিছানায় ফিরে এল টম। ডেভের চোখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। ডেভ খুব ভয় পেয়েছে। ওরও বুক ধড়ফড় করছে অমঙ্গলের আশঙ্কায়। তবু ডেভকে সাহস দিতে বলল, 'শোন, আমাদের কোনও ক্ষতি হবে না।'

দরজায় কেউ নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করেছে। ঝট করে সেদিকে চোখ চলে গেল দুই বন্ধুর। মোচড় খাচ্ছে দরজার নব। কেউ খোলার চেষ্টা করছে।

'না, না, না...' বিছানায় বসে কাঁপতে লাগল ডেভ। মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

'ছিটকিনি বন্ধ। খুলতে পারবে না।' নিজেকে যেন ভরসা যোগাতেই আপন মনে কথাটা বলল টম।

তখন, যেন নিজে নিজেই দরজার ফ্রেম থেকে খুলে গেল ছিটকিনি। দুই তরুণ ভয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখল খুব ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে কবাট। কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হওয়ার পরে আর খুলল না। মৃত্যুর নৈঃশব্দ নেমে এল ঘরে।

তারপর সেই রক্ত হিম করা বিকট, ভৌতিক খলখলে গলার হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকতে লাগল আকৃতিহীন সবুজ, তুলতুলে একটা বস্তু। গলে গলে পড়ছে ঘরে।

ডেভ তার খাটের শেষ মাথায়, দেয়ালে গিয়ে সেঁধিয়েছে। টম লাফ মেরে নেমে পড়ল বিছানা থেকে, ঘরের এক কিনারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল ঠকঠক করে।

দরজার ফাঁক দিয়ে গলে পড়া জিনিসটা সবুজ জেলির মত। বিকট গন্ধ তাতে। ওদের দম প্রায় বন্ধ করে দিল। তারপর হঠাৎ করেই সবুজ জেলির মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর একটা মুখ। মুখটার চারপাশে ছুরির অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। মুখটা খলখলে গলায়

হেসে উঠল। তারপর যেভাবে উদয় হয়েছিল তেমনি আকস্মিকভাবে ঘন সবুজ জেলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

খাটে বসা ডেভের গলা দিয়ে ঘরঘর শব্দ বেরুচ্ছে। চিৎকার করার চেষ্টা করছে, পারছে না। সবুজ জেলি বাতাসে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে গেল ওর দিকে। যেন ভয়ার্ত ডেভকে তার পছন্দ হয়েছে।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো টম বুঝতে পারল পালাবার এটাই সুযোগ। সে দেয়াল ঘষটে ঘষটে ধীর গতিতে এগোল দরজার দিকে। তারপর দিল ছুট। সবুজ জেলির পাশ কাটানোর সময় ঠাণ্ডা, পিচ্ছিল কী যেন লেগে গেল ওর হাতে। ঘুরে তাকাল টম। ডেভ ওর দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চাউনিতে মৃত্যু ভয়।

আরও জোরে ছুটল টম। ঝড়ের বেগে নেমে এল নীচতলায়। যে জানালা দিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে ওটা এখনও খোলা। লাফ মেরে জানালা দিয়ে নেমে পড়ল টম। হাচড়ে পাচড়ে ছুটল লোহার শিক বসানো গেটের দিকে। পাগলের মত গেট বাইল যেন ভূতে তাড়া করেছে। রাস্তায় এসে তাকাল বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে। কিছুই ‍খতে পেল না। হঠাৎ সেই ভয়ঙ্কর হাসি ওর আত্মা কাঁপিয়ে ‍ল।

পড়িম ‍রি করে ছুটল টম। কুয়াশা ঘেরা রাস্তায় জানবাজি রেখে দৌড়াচ্ছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। এক মুহূর্তের জন্য থামল। শুনতে পেল ডেভের মরণ আর্তনাদ।

আবার ছুটতে শুরু করল টম। দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এল সেন্ট জেমস পার্কে। কিন্তু থামল না ও। ছুটতেই লাগল।

লন্ডন, ২১ জুন–

আজ সকালে পুলিশ ১৮ বছরের ডেভ মূরের লাশ ৫০, বার্কলি স্কোয়ারের বাড়ির গেটে শিকবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করেছে। চারতলা বাড়িটির জানালা খোলা ছিল। হোমিসাইড ডিটেকটিভদের ধারণা, তরুণ আমেরিকানকে চিলেকোঠার ঘর থেকে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে। তার সঙ্গী ১৮ বছরের টম ডডকে জেরা করার জন্য খুঁজছে পুলিশ। এটা আত্মহত্যার কেস নয় বলে গোয়েন্দাদের ধারণা। কারণ ডেভের শরীরে ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে। ৫০ বার্কলি স্কোয়ারের বাড়িটি যদিও 'ভূতের বাড়ি' হিসেবে জানে স্থানীয়রা তবে হোমিসাইড স্কোয়াড সাংবাদিকদের বলেছে, 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ভূতে বিশ্বাস করে না।'

চিলেকোঠা

মরচে ধরা লোহার গেটটা ধাক্কা দিল নীতু। ক্যা-আ-আচ শব্দে খুলে গেল ওটা। সদর দরজার দিকে পা বাড়াল নীতু। দরজার মাথায় লাইলাকের ঘন ঝাড় ঝুলছে; গন্ধটা মিষ্টি তবে কেমন যেন দম বন্ধ করে দেয়।

পেতলের ভারী কড়া ধরে নাড়ল নীতু। কয়েক সেকেন্ড পরে খুলে গেল দরজা।

'নীতু, সত্যি তুই? কত্ত বড় হয়ে গেছিস! চেনাই যাচ্ছে না!' ওকে জড়িয়ে ধরলেন হ্যারিয়েট ফুপু। তাঁর গা থেকেও লাইলাকের গন্ধ আসছে।

'কেমন আছ, ফুপু?' জিজ্ঞেস করল নীতু।

'ভাল। আয়, ভেতরে আয়, মা। গরমে একদম ঘেমে গেছিস। ঘরে ঠাণ্ডা আছে।'

নীতু ফুপুর পিছু পিছু একটি বড়, অন্ধকার হলওয়েতে ঢুকল। মাটির নীচের গুহার মতই শীতল হলঘর।

'কতদিন পরে দেখলাম তোকে! পনেরো বছর তো হবেই। ট্রেনে কোনও কষ্ট হয়নি তো?' জবাবের অপেক্ষা না করে বকবক করেই যেতে লাগলেন ফুপু। 'তোর বাবাকে কতবার লিখেছি তোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। তোর বাবা তোর ফুপাকে পছন্দ করে না জানি। কিন্তু তোর ফুপাও তো মারা গেছে

চার বছর হলো.... বিরতি দিলেন হ্যারিয়েট ফুপু। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'আর্থার আত্মহত্যা করেছে চার বছর হলো।' নীতু নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকল। কী বলবে বুঝতে পারছে না। বাবা ওকে বলেছেন হ্যারিয়েট ফুপু একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। ঠিকই বলেছেন।

'তোমাদের বাড়িটি খুব বড়, ফুপু,' বলল নীতু।

'মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নে। তারপর বাড়িটি তোকে ঘুরিয়ে দেখাব। চল, তোর শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

'শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই,' তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল কেউ।

'কে কথা বলে?' অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল নীতু। খনখনে গলায় হেসে উঠলেন ফুপু। গায়ে কাঁটা দিল নীতুর। ফুপু হলওয়ের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেলেন। সবুজ ভেলভেটের কাপড় সরাতেই একটি খাঁচা দেখতে পেল নীতু। খাঁচার ভেতরে একটি কাকাতুয়া।

'ওর নাম পলি, তা-ই না, পলি?' পাখির মত কিচকিচ শব্দ করলেন হ্যারিয়েট ফুপু।

পাখির খাঁচার ধারে গেল না নীতু। সে কাকাতুয়া একদম পছন্দ করে না। 'ফুপু, আমি বরং আমার ঘরে যাই।'

'হ্যাঁ, চল, চল....আমি এক্ষুনি ফিরছি, পলি,' বললেন ফুপু।

নীতুকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলেন মিসেস হ্যারিয়েট। হলঘরের শেষ মাথার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'এটা তোর ঘর, নীতু। আশা করি পছন্দ হবে। বিয়ের সময় এটা বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতাম।'

ভেতরে উঁকি দিল নীতু। গোটা ঘরে লাইলাকের ছড়াছড়ি। বিছানার চাদরে উজ্জ্বল রঙের লাইলাকের ছাপা; ওয়াল পেপারে

সাদা লাইলাক। এমনকী আসবাবগুলোর গায়েও তাই

'তুই একটু বিশ্রাম নে, নীতু। তারপর নীচে আসিস, একসঙ্গে চা খাব।'

মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল নীতু। বিশ মিনিট পরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। ফুপুর সঙ্গে চা খাবে। মূল হলওয়েতে সূর্যালোকিত একটি ঘরে ভাতিঝির জন্য অপেক্ষা করছিলেন হ্যারিয়েট ফুপু। সোফার পাশের ছোট টেবিলে চা এবং কেক সাজিয়ে রাখা।

'কেকগুলো ঘরে বানানো, নীতু,' বললেন ফুপু। 'তুই এসেছিস খুব খুশি হয়েছি। মাঝে মাঝে এমন একা লাগে! পলি আর আমি একা বসে বেশিরভাগ সময় খাই। তা-ই না, পলি?'

'একা খাই,' কর্কশ গলায় বলে উঠল পলি। নীতু লক্ষ করল কাকাতুয়ার খাঁচাটি জানালার ধারে বসানো হয়েছে।

নীতু কেক খেল। স্বাদ ভালই। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঘরে চোখ বুলাতে লাগল। আসবাবগুলো মান্ধাতা আমলের। ল্যাম্পগুলো শেড থেকে ঝুলে আছে, তাতে ক্রিস্টালের পুঁতি। চেয়ার কভারগুলো মখমলের। দেখেই বোঝা যায় অনেক পুরানো, ভাঁজ খেয়ে রয়েছে নানান জায়গায়। ছোট ছোট অসংখ্য স্ট্যাচু এবং ছবি সারা ঘর জুড়ে। একটা ছবিতে নজর আটকে গেল নীতুর। 'ও কি আমার ফুপাতো ভাই হারম্যান?'

হাহাকারের মত একটা শব্দ বেরুল ফুপুর গলা দিয়ে।

'সরি, ফুপু। আমি বুঝতে পারিনি তুমি কষ্ট পাবে,' বলল নীতু। বিব্রত বোধ করছে। সে শুনেছে হারম্যান খুব অল্প বয়সে মারা গেছে। ছেলের মৃত্যুর মাসখানেক বাদেই আত্মহত্যা করেন আর্থার ফুপা। ফুপুর সঙ্গে নীতু কিংবা তার বাবার যোগাযোগ শুধু টেলিফোন এবং চিঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নীতুর বাবার

কোনও ভাই নেই, বোন এই একজনই—হ্যারিয়েট। নীতুকে তার বাবা বলেছে প্রেম করে বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করায় ফুপু তার ছোট ভাইয়ের ওপর সাংঘাতিক রেগে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ভাইয়ের মুখদর্শন করেননি। নীতুর মা'র সঙ্গে কোনওদিনই কথা বলেননি। নীতুকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায় তার মা। এরপর নীতুকে দেখতে গিয়েছিলেন হ্যারিয়েট ফুপু। হয়তো রক্তের টানেই...ফুপাতো ভাই হারম্যানের কথা শুধু বাবা ও ফুপুর কাছেই শুনেছে নীতু। আজ ছবি দেখল।

সে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'তুমি তো জানোই, ফুপু, হারম্যান ভাইয়ার জন্য কীরকম টান ছিল আমার। যদিও কোনওদিন দেখিনি ওকে...কিন্তু আমাদের জন্ম তো একই বছরে। ও মারা গেছে শুনে খুব কেঁদেছিলাম আমি।'

ফুপু সামলে নিয়েছেন নিজেকে। 'হ্যাঁরে, ওটা তোর হারম্যান ভাইয়ারই ছবি। যাক, বাদ দে। যা গেছে গেছে। ও নিয়ে আর মন খারাপ করতে হবে না। চল, তোকে বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাই।'

নীতু তার ফুপুর পেছন পেছন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার সেই অন্ধকার হলওয়েতে ঢুকল।

'তোকে আগে তোর আর্থার ফুপার পড়ার ঘর এবং ল্যাবরেটরি দেখাব। তুই তো জানিস, আর্থার খুব বড় মাপের বিজ্ঞানী ছিলেন। সবসময় সময়ের আগে এগিয়ে থাকতেন। ইউনিভার্সিটির লোকজন তাঁকে ঈর্ষা করত। এ জন্য ভার্সিটির চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে গবেষণা শুরু করেছিলেন তিনি।'

একটি প্রকাণ্ড ঘরে ঢুকল ওরা। এ ঘরে শুধু বই আর বই। নীতু অবাক চোখে চারদিক দেখছে। এখানে বসে আর্থার ফুপা কাজ করতেন। শুনেছে তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন। তবে বাবা কখনোই

ফুপার বিষয়ে কোনও কথা বলত না। নীতু জানে কী একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছিল ফুপাকে।

'আর এদিকে,' একটা দরজা দেখালেন ফুপু। 'তোর ফুপার গবেষণাগার।'

পরের ঘরটা কেমন গা ছমছমে। ঘরভর্তি নানান কাচের জার, টেস্টটিউবসহ বৈজ্ঞানিক আরও জিনিসপত্র। জারগুলোর গায়ে বিভিন্ন লেবেল সাঁটানো। ভেতরে কেমিকেল।

'আর্থার ফুপা কী নিয়ে গবেষণা করতেন?' জিজ্ঞেস করল নীতু।

'উনি জীব বিজ্ঞানী ছিলেন, বিরাট বায়োলজিস্ট,' সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বললেন হ্যারিয়েট ফুপু। 'হিউম্যান মিউটেশন মানে মানব দেহের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতেন।'

'ও, আচ্ছা,' বলল নীতু। দেয়ালে চোখ বুলাল। ওখানে গরিলা এবং বানরের পাশাপাশি মানুষের শরীরের ছবিও ঝুলছে।

'নীতু, একটা কথা–এ দু'টি ঘরের কোনও কিছুতে হাত দেয়া যাবে না। আমার স্বামীর কাজের নিদর্শন রয়ে গেছে এ ঘর দু'টিতে। একদিন বিজ্ঞান বুঝতে পারবে উনি কতটা প্রতিভাবান ছিলেন। এ ঘর দু'টি যেমন আছে সবসময় তেমন থাকবে।'

'অবশ্যই ফুপু,' বলল নীতু। ফুপুর পেছন পেছন স্টাডিরুম হয়ে আবার চলে এল হলঘরে।

'বাড়ির বাকি ঘরগুলো তুই নিজেই ঘুরে দেখতে পারবি, নীতু,' বললেন ফুপু। 'তবে চিলেকোঠায় ভুলেও যাবি না।' তাঁর কণ্ঠ কঠিন শোনাল। 'আমার কথা বুঝতে পেরেছিস?'

'আমার কথা বুঝতে পেরেছিস?' পাশের ঘর থেকে পুনরাবৃত্তি করল কাকাতুয়া।

'আমি কিন্তু খুব সিরিয়াস, নীতু। চিলেকোঠার দরজা ভুলেও খুলবি না। খুললে পস্তাবি।'

'খুললে পস্তাবি,' ক্যাকক্যাক করে উঠল পলি।

শিরশির করে উঠল নীতুর গা। 'বুঝতে পেরেছি, ফুপু।'

নীতু একা একাই ঘুরে দেখল বাড়ি। পুরানো বইয়ের অভাব নেই বাড়িতে। সেসব উল্টেপাল্টে দেখল। রাতে ফুপুর সঙ্গে বাগানে বসে চা খেল। নীতুর বাবার সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করলেন ফুপু। জানতে চাইলেন নীতু বাংলাদেশে কখনও গেছে কি না। নীতু জানাল এখনও যায়নি, তবে যাবে। নীতু যখনই হারম্যান সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছে, প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন হ্যারিয়েট ফুপু।

এ বাড়িতে বেড়াতে আসার চতুর্থ দিনে ফুপু জানালেন তিনি আজ বিকেলে বাসায় থাকছেন না। এক বান্ধবীর বাড়িতে চায়ের দাওয়াত আছে, সেখানে যাবেন। নীতুর মন চাইলে যেতে পারে।

কিন্তু নীতু যেতে চাইল না। বুড়ো মানুষদের আড্ডা তার ভাল্লাগে না। ফুপুকে জানাল সে বাড়িতেই থাকবে। বাগানে বসে বই পড়ে কাটাবে সময়।

ফুপু চলে যাওয়ার পরে নিজের ঘরে ঢুকল নীতু। সঙ্গে নিয়ে আসা একটা হরর বই পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ভ্যাম্পায়ারের কাহিনি তাকে আকৃষ্ট করতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে ফেলল নীতু। সিধে হলো। বেরিয়ে এল হলঘরে। কী করা যায় ভাবছে। কিন্তু করার মত কোনও কাজ নেই। ফুপুর বাড়িতে গরমের ছুটিটা কাটছে খুবই বিরক্তিকর ভাবে। নীতু আসতে চায়নি। কিন্তু বাবা একরকম জোর করে পাঠিয়েছেন ওকে। তিনি ব্যবসার কাজে অস্ট্রেলিয়া যাবেন। নরফোকের বাড়িতে নীতু একা থাকবে, ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না তাঁর। ওদিকে তাঁর বড় বোন

হ্যারিয়েট মাঝে মাঝেই ফোন করে হুকুম দিয়েছেন এবারের ছুটিতে নীতুকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

দুলাভাইকে পছন্দ না করলেও বড় বোনকে ভয় পান নীতুর বাবা। তাই তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারেননি। নীতুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ফুপু বাড়ি। কিন্তু এত বড় বাড়িতে সঙ্গীহীন ষোড়শী নীতুর চঞ্চল মন হাঁপিয়ে উঠছে।

হলঘর ধরে হাঁটছে নীতু, চোখ চলে গেল চিলেকোঠার দরজায়। দরজার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল ও। হ্যারিয়েট ওকে পইপই করে মানা করেছেন চিলেকোঠার ধারেকাছেও যেন না যায় নীতু। এর মধ্যে কী রহস্য আছে...নীতুর খুব কৌতূহল হলো রহস্য ভেদ করবে। ফুপুর সাবধান বাণী জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিল। দরজার নবে হাত রাখল। মোচড় দিল। মোচড় খেল নব। তার মানে তালা মারা নেই। কিন্তু নীতু ডোরনব থেকে সরিয়ে নিল হাত। দ্বিধায় ভুগছে। ফুপু বলেছেন এ ঘরে না যেতে।

চলে যাচ্ছিল নীতু। কিন্তু কৌতূহলের জয় হলো। হ্যারিয়েট ফুপু পাগলাটে স্বভাবের মানুষ, নীতুর বাবা আগেই ওকে সাবধান করে দিয়েছেন, পাগল মানুষ কত উদ্ভট কথাই তো বলে। তাদের সব কথা বিশ্বাস করা বোকামি।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নীতু। ডোরনবে আবার হাত রাখল ও, মোচড় দিল জোরে। তারপর ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল দরজা। কতগুলো সিঁড়ি উঠে গেছে চিলেকোঠায়। নীতু ধীর পায়ে বাইতে লাগল সিঁড়ি। চিলেকোঠার মেঝের সমান্তরালে ও এসেছে, একটা দৃশ্য দেখে জমে গেল। ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে–একটা অর্ধমানব ও অর্ধ জানোয়ারের দিকে। ভয়ঙ্কর প্রাণীটা কটমট করে চেয়ে আছে নীতুর দিকে। মুখ দিয়ে

আর্তচিৎকার বেরুল নীতুর। হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে।

অসুস্থ বোধ করছে নীতু। যা দেখেছে বিশ্বাস করতে চাইছে না মন। কী ভয়ঙ্কর দানব! চিলেকোঠার দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে দৌড়াল নীতু। তারপর শুনতে পেল সেই শব্দ যার ভয় পাচ্ছিল এতক্ষণ। থপ্ থপ্ থপ্ থপ্। চিলেকোঠার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে ওটা–পিছু নিয়েছে নীতুর।

নীতুর মনে হলো হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে ও। হল ল্যান্ডিং-এ সৃষ্টি ছাড়া জীবটাকে দেখতে পেল ও। দৌড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। কুৎসিত প্রাণীটা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। কালো, ঘন লোমে বোঝাই একটা হাত বাড়িয়ে দিল। ছুটল নীতু।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে আরেকটু হলে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। পিশাচটা ওর পেছন পেছন আসছে। ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে ওটা। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে নীতু। ও একছুটে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে।

এক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝে ফেলল নীতু এ ঘর থেকে বেরুবার রাস্তা নেই। আবার দরজা লক্ষ্য করে ছুটল। থাবা চালাল জানোয়ার। অল্পের জন্য মিস হলো টার্গেট। বাউলি কেটে বেরিয়ে এল নীতু।

হলঘর ধরে কিচেনের দিকে ছুটল নীতু। কদাকার অন্ধকারের প্রাণীটা টলতে টলতে ওর দিকেই আসছে। ওটার মুখ মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল নীতু। ওটার চেহারা– অনেকটা মানুষের মত–এজন্যই অস্বস্তি বেশি লাগছে ওর। রান্নাঘরের খিড়কির দরজা খুলে বারান্দায় চলে এল নীতু। কিন্তু যখন বুঝতে পারল বাগান থেকে বেরুবার রাস্তা নেই, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

বাগানের পাথুরে দেয়ালে পিঠ চেপে ধরল নীতু। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বীভৎস প্রাণীটা, এগোচ্ছে নীতুর দিকে। কুৎসিত মুখে নোংরা হাসি। আবার থাবা চালাল ওটা। আরেকবার বাউলি কেটে টার্গেট মিস করে দিল নীতু।

কিন্তু ওটা নীতুর অনেক কাছে চলে এসেছে। নীতু রান্নাঘরে ছুটল। সেখান থেকে হলঘরে। তবে সদর দরজায় পৌঁছুতে পারল না। তার আগেই কীসের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

ভয়ঙ্কর জীবটা নীতুর সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িয়ে দিল রোমশ হাত। নীতুর মাথা স্পর্শ করল।

'তুমি এসেছ,' বলল ওটা মানুষের গলায়।

'তুমি এসেছ,' খাঁচায় বসে ভেংচাল কাকাতুয়া। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল নীতু।

জ্ঞান ফিরে পেল নীতু, চোখ মেলে চাইতেই চমকে গেল ভয়ানক। সৃষ্টিছাড়া জীবটা এখনও ঝুঁকে দেখছে ওকে। তার পাশে হ্যারিয়েট ফুপু।

'নীতু, তুই একটা বদমাশ। মানা করেছিলাম না চিলেকোঠার ধারে কাছেও ঘেঁষবি না। বলেছিলাম ওখানে গেলে পস্তাবি।' রাগে নীতুর দিকে আঙুল তুলে নাড়লেন তিনি। 'তোর কারণে ভয় পেয়েছে বেচারা হারম্যান।'

'বেচারা হারম্যান,' পুনরাবৃত্তি করল কাকাতুয়া।

'হ্যাঁ, বেচারাই তো,' বললেন ফুপু, আদর করে নেড়ে দিলেন ছেলের মাথার চুল। 'আর্থার ওকে নিয়ে কত এক্সপেরিমেন্ট করল অথচ ও আর আগের চেহারা ফিরে পেল না।'

নীতুর দিকে ফিরলেন হ্যারিয়েট ফুপু। 'তোকে আর আমরা

ছাড়তে পারব না, নীতু। কারণ তুই এখন আমাদের গোপন কথা জেনে ফেলেছিস। তোর বাবা অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে তোর খবর নেয়ার জন্য ফোন করলে জানিয়ে দেব তুই আমাদের এখানে আসিসইনি। আমরা চিলেকোঠায় ওর জন্য চমৎকার একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারব, তাই না, হারম্যান?'

উন্মাদ ফুপুর দিকে তাকাল নীতু। তারপর চাইল ফুপাতো ভাইয়ের দিকে। হারম্যানের কদাকার চেহারায় জান্তব উল্লাস।

'আমাদের সঙ্গ তোর মন্দ লাগবে না, নীতু।' বললেন ফুপু।

'মন্দ লাগবে না,' ক্যাকক্যাক করল কাকাতুয়া।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল নীতু। তারপর জ্ঞান হারাল আবার।

হারম্যান ওর অচেতন দেহ আলগোছে তুলে নিল কোলে, তারপর চলল চিলেকোঠার সিঁড়ি অভিমুখে।

রক্তচক্ষু

জানুয়ারি ৪, ১৯৪৯

ওই চোখ! লাল টকটকে একজোড়া চোখ! ক্রোধ যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখজোড়া থেকে। ওদিকে চোখ পড়লে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় আমার। মনে হয় ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ওই চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে। ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকি। সরে যাই ওই ভয়াল চাউনির সামনে থেকে।

কিন্তু আমি অসহায়। তীব্র ভয়ে সমস্ত শরীর অসাড় আমার। বিছানায় শুয়ে জানালার বাইরে থেকে ভুতুড়ে ওই চোখ দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারি না আমি। অথচ ওই চোখের অধিকারী নেকড়েটিকে নিজের হাতে এক হপ্তা আগে হত্যা করেছি আমি।

ওপরের ওই লেখাটি একটি ডায়েরির। ট্রয় ব্রাডফোর্ড নামে এক তেরো বছরের কিশোরের লেখাটি পড়ার সময় ছমছম করে উঠল গা।

ট্রয় এবং তার বাবা জ্যাক কানাডার ম্যানিটোবার এক খামার বাড়িতে এসেছে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে। এ বাড়িতে ব্রাডফোর্ড পরিবার একসময় বাস করত। বাড়ির মূল মালিক ট্রয়ের দাদু অর্থাৎ ওর বাবার বড় চাচা স্কালি ব্রাডফোর্ড। তিনি ছিলেন খেয়ালী

স্বভাবের মানুষ। আত্মীয়স্বজনের চেয়ে খামারের জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে সময় কাটাতেই পছন্দ করতেন।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যর সঙ্গে স্কালির দেখা সাক্ষাৎ কমই হত। তবে তিনি ভাতিজা আর ভাতিজিদের কাছে ছুটির সময় চিঠি লিখে যোগাযোগটা রক্ষা করে চলতেন। অবশ্য সে সব চিঠির বেশিরভাগ জুড়ে থাকত কীভাবে একটি ছোট খামার দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যায় তার ফিরিস্তি। লিখতেন খামারের গরু, ভেড়া, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি সম্পর্কে।

১৯৮৫ সালে ৭৭ বছর বয়সে মারা যান স্কালি চাচা। ব্রাডফোর্ড পরিবার খামারটা লিজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে খামার বাড়ির মালিকানা তাদের হাতেই থাকে।

ট্রয় আর তার বাবা এখানে এসেছে বাড়িটার কিছু অংশ মেরামত করার জন্যে। নতুন দরজা-জানালা বানাল ওরা, তারপর হাত দিল ফায়ারপ্লেসের আলগা হয়ে যাওয়া পাথর সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানোর কাজে।

ট্রয়ের বাবা বাইরে সিমেন্ট মাখাতে ব্যস্ত, ট্রয় ফায়ারপ্লেসের প্রতিটি পাথর পরীক্ষা করে দেখল কোনটাতে সিমেন্ট লাগাতে হবে। সফটবল সাইজের একখণ্ড পাথর বেরুল ফায়ারপ্লেসের নীচ থেকে। ওটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ট্রয়। কারণ পাথরখণ্ডের গায়ে সিমেন্টের কোনও দাগ নেই। যেখান থেকে টুকরোটা তুলে এনেছে সেই গর্তে উঁকি দিল ট্রয়। ভেতরে ছোট, বাদামী রঙের একখানা বই পড়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে বইটা তুলে আনল ট্রয়। একটা পুরনো নোট বই। চামড়া দিয়ে বাঁধানো। প্রথম পৃষ্ঠাটা ওল্টাল ও। ওখানে কালো কালিতে লেখা 'রেনেগেড'। নোটবইয়ের অন্যান্য পাতাগুলো ভরে আছে গোটা গোটা অক্ষরের হাতের লেখায়।

পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে। বোঝাই যায় অনেক পুরানো।

সাবধানে পৃষ্ঠা উল্টে চলল ট্রয়। থমকে গেল জানুয়ারি ৪, ১৯৪৯ লেখা পাতাটিতে এসে। এ পাতায় বর্ণনা দেয়া হয়েছে রক্তচক্ষু নেকড়ের।

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল ট্রয়। 'দেখে যাও কী জিনিস পেয়েছি।'

ট্রয়ের বাবা নোটবইখানা উল্টেপাল্টে দেখে মন্তব্য করলেন, 'বোঝাই যাচ্ছে এটা স্কালি চাচার জিনিস। তাঁর হাতের লেখা আমি চিনি। ছেলেবেলায় মজার মজার চিঠি লিখতেন তিনি আমাকে।'

'কিন্তু রেনেগেডটা কে?' জিজ্ঞেস করল ট্রয়।

'নামটা চেনা চেনা লাগছে। তবে এ মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না। দেখি তো প্রথম পাতাটা পড়ে কী লিখেছে।'

মার্চ ১৪, ১৯৪৮

আমার চতুষ্পদ পশুটির জন্যে ডায়েরি লিখব ঠিক করেছি। ওটা এক মাস বয়সের একটা নেকড়ের বাচ্চা। মা-বাবা নেই। ওকে একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছি আমি। বাচ্চাটার বাবা-মা'র খোঁজ করেও ব্যর্থ হয়েছি। নেকড়ে মা সাধারণত এক সাথে আধ ডজন বাচ্চার জন্ম দেয়। বুঝতে পারছি এ বাচ্চাটা পরিবারের আদর-যত্ন থেকে বঞ্চিত। মা'র দুধও হয়তো বেশিদিন খেতে পায়নি বেচারী। ঠাণ্ডায় কাঁপছিল বাচ্চাটা। ওকে এভাবে অসহায় ভাবে মরতে দিতে মন চায়নি আমার। তাই বাড়িতে নিয়ে এসেছি। পুষব ঠিক করেছি। ওর নাম দেব রেনেগেড।

আমার প্রতিবেশী কৃষকরা রেনেগেডকে মেনে নিতে চাইবে না জানি। কারণ নেকড়েরা চাষাদের চরম শত্রু। নেকড়েরা সুযোগ পেলেই ওদের হাঁস-মুরগী, ভেড়াদের ওপর হামলা চালিয়ে বসে।

কাজেই নেকড়েদের কৃষকরা ঘৃণার চোখে তো দেখবেই।

কিন্তু এই ছোট নেকড়ের বাচ্চাটার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আমার প্রিয় ভেড়া মেলাডির জন্যে রেনেগেড হুমকি হয়ে ওঠার আশংকা থাকলেও বাচ্চাটাকে ফেলে দিতে পারব না। আমি বিশ্বাস করি বুনো প্রাণীদের মধ্যেও ভাল কিছু গুণ থাকে। ওরা বুদ্ধিমান এবং ধূর্ত হয়। আমি প্রমাণ করে দেব ভালবাসা আর ধৈর্য নিয়ে প্রতিপালন করলে নেকড়েও মানুষের কাজে লাগতে পারে, হয়ে উঠতে পারে তাদের বন্ধু।

'এখন মনে পড়েছে,' জ্যাক বললেন তাঁর ছেলেকে, 'স্কালি চাচা রেনেগেড নামে একটা নেকড়ের বাচ্চাকে পুষতে শুরু করেছিলেন। একবার নেকড়েটাকে নিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন আমাকে। এক বছর বয়সে মারা যায় রেনেগেড। চাচা তারপর ওটার কথা আর কখনও উল্লেখ করেননি।'

ডাইরিতে স্কালি কীভাবে নেকড়ের বাচ্চাটাকে লালন-পালন করছেন, কীভাবে ওটা বড় হয়ে উঠছে, ট্রেনিং নিচ্ছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। গরম শেষ হবার আগেই রেনেগেড বসতে শিখে যায়, কোনও জিনিস দূরে ছুঁড়ে মারলে তা দৌড়ে নিয়ে আসতে পারত, নাম ধরে ডাকলেই চলে আসত কাছে।

সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৪৮

সবাই আমাকে বোঝাতে চাইছে একমাত্র ভাল নেকড়ে হলো মৃত নেকড়ে। আমার চেনাজানা কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে এই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোর বিরুদ্ধে। এ বছর একশোরও বেশি নেকড়ে গুলি করে মেরেছে ওরা, যেন পৃথিবীর বুক থেকে নেকড়ের বংশ ধ্বংস করে তবে ছাড়বে।

কী ভুলটাই না করছে ওরা! এই প্রাণীগুলোকে অবশ্যই রক্ষা করা উচিত।

রেনেগেড বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ওর নমনীয় শরীরের শক্তিশালী পেশী কিলবিল করে ওঠে নড়াচড়ার সময়। রূপোর মত চকচকে চামড়া ওর। রেনেগেডের গলায় পরিয়ে দিয়েছি ব্রোঞ্জ রঙের চওড়া রিং, যেন মিশরীয় রাজার গলার হার।

রেনেগেড়কে এক কথায় অদ্বিতীয় বলা যায়। এ এলাকার অন্যান্য নেকড়ের মত ওরও সামনের প্রতিটি থাবায় একটি করে অতিরিক্ত আঙুল, আর পেছনের থাবায় তিনটে করে।

তবে আমি সবচে' মুগ্ধ হই রেনেগেডের চোখ দেখে। বুদ্ধির ঝিলিক ওঠে ওই চোখে। বুনো চাউনির মাঝেও আমার জন্যে ফুটে ওঠে সমীহ। তবু চোখজোড়ার দিকে তাকালে কেন জানি মাঝে মাঝে শিরশির করে ওঠে গা। ওর রক্তে রয়েছে খুনের নেশা। তবু ওকে বিশ্বাস করি আমি। বিশ্বাস আর ভালবাসার একটা বন্ধন গড়ে উঠেছে আমাদের দু'জনের মধ্যে।

অক্টোবর ২৫, ১৯৪৮

ব্যাপারটা এখন আর হাসি-তামাশার পর্যায়ে নেই। আমি ওদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি আমার নেকড়ের গায়ে হাত দেয়ার দুঃসাহস যেন কেউ না দেখায়। ওরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে আমি নাকি একটা খুনীকে পুষে বড় করছি। কিন্তু আমি জানি রেনেগেড খুনী নয়।

তবে একথা সত্য আমি এবারের গ্রীষ্মে একটা বাছুর আর একটা ছাগল হারিয়েছি নেকড়ের হামলায়। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে রেনেগেড দায়ী নয়। মাটিতে পায়ের ছাপ লক্ষ করেছি। রেনেগেডের সাথে মেলে না। রেনেগেড বুনো স্বভাবের নয়। ও

আমার একান্তই পোষ্য, ভীরু একটা প্রাণী।

নভেম্বর ২৩, ১৯৪৮

অন্যান্যের মত আমার খামার সেভাবে আক্রান্ত হয়নি নেকড়েদের দ্বারা। রেনেগেড তার জাতভাইদের আমার এলাকা থেকে দূরে সরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে কি না কে জানে। ও আমার খামারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আমাদেরকে আগলে রাখছে রেনেগেড। রাতে ওর ডাক কানে ভেসে এলে স্বস্তি পাই আমি।

ডিসেম্বর ২৮, ১৯৪৮

এ আমি কী করলাম? এরকম একটা ভুল আমি করতে পারলাম? তীব্র অনুশোচনার আগুনে বুকটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই।

শহর থেকে কিছু জিনিস কিনে মাত্র বাড়ি ফিরছি আমি, কানে ভেসে এল মেলোডির আর্ত-চিৎকার। মেলোডি গত বছর এলাকার সেরা ভেড়া হিসেবে নীল ফিতে জিতে নিয়েছে। খুব প্রিয় আমার মেলোডি। ওর আর্তনাদ শুনে দৌড়ে গেলাম খোঁয়াড়ে। দেখলাম মরতে বসেছে মেলোডি। সমস্ত শরীরে ক্ষত। কেউ তীব্র আক্রোশে আঁচড়ে খামছে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে মেলোডিকে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে রেনেগেড, থাবা বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে রক্ত।

তা হলে রেনেগেডই ওর এমন দশা করেছে। ইস্, কী যে ভুল করেছি আমি ওটাকে আশ্রয় দিয়ে। ভুলে গিয়েছিলাম নেকড়ে নেকড়েই। সাপকে যতই দুধকলা খাওয়াও, সুযোগ পেলেই সে ছোবল দেবে, নেকড়েও তেমনি। ওদেরকে আসলে পোষ মানানো

সম্ভব নয়। ওদের রক্তেই মিশে আছে হিংস্রতা।

আমার সবচে' প্রিয় প্রাণীটি মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে হঠাৎ হেঁচকি তুলে থেমে গেল। মারা গেছে। আর ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী ওই নেকড়েটা যাকে আমি বন্ধু ভেবে বিশ্বাস করেছিলাম। দাঁড়িয়ে আছে ওটা। আমার দিকে দৃষ্টি। যেন ব্যঙ্গ করছে। বিশ্বাসঘাতক!

আমার ভেতরে ক্রোধের একটা বিস্ফোরণ ঘটল। চট করে বন্দুকটা তুলে তাক করলাম, চালিয়ে দিলাম গুলি। সাথে সাথে মারা গেল রেনেগেড। খুশি হয়ে উঠলাম মনে মনে। মেলোডির হত্যার শোধ নিয়েছি তো!

কিন্তু একটু পরেই আমার আনন্দ বিষাদে পরিণত হলো। ভয়ঙ্কর সত্যটা উদঘাটন করতে পেরে ফাঁকা হয়ে গেল ভেতরটা। হায় হায়, এ কী করেছি আমি!

মৃত ভেড়া আর নেকড়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে যে দৃশ্য দেখতে পেলাম ধক্ করে উঠল বুক। আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার সামনে আমার বাড়ির পেছনে বারান্দা। বারান্দার পরে একটা খাল। আর খালের কিনারে পড়ে আছে বিশালদেহী একটা ধূসর নেকড়ে। গলাটা ছিন্ন-ভিন্ন। ওখানে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কী ঘটেছে বুঝে উঠতে সময় লাগল। মাটিতে ভেজা পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ গোটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

রেনেগেড হামলা চালায়নি মেলোডিকে! কাজটা করেছে ওই ধূসর নেকড়েটা। রেনেগেড বরং রক্ষা করতে গিয়েছিল মেলোডিকে। প্রচণ্ড মারামারি হয় তার ধূসর নেকড়ের সঙ্গে। রেনেগেডের থাবায় যে রক্ত আমি ঝরতে দেখেছি তা মেলোডির নয়। ওই নেকড়ের রক্ত!

ইস্, রাগের মাথায় এ কী কাণ্ড করেছি আমি। নিজের হাতে মেরে ফেললাম আমার বিশ্বস্ত সঙ্গীকে!

নাহ্, আমার আর হাত চলছে না। আজ আর কিছু লিখতে পারব না।

'এ জন্যেই স্কালি চাচা রেনেগেড সম্পর্কে আমার কাছে আর কিছু লেখেননি।' মন্তব্য করলেন জ্যাক। 'খুবই আপসেট হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ভুল করে রেনেগেডকে মেরে ফেলেছেন শুনলে প্রতিবেশীরা তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করত। তাই কাউকে কিছু বলেননি।'

'ডায়েরিটা তোমার চাচা লুকিয়ে রেখেছিলেন যাতে ব্যাপারটা কেউ জানতে না পারে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ট্রয়।

'হতে পারে,' জবাব দিলেন জ্যাক। 'কিন্তু ডায়েরিটা তিনি পুড়িয়ে ফেললেই পারতেন। রেখে দিলেন কেন!'

'বাবা, স্কালি দাদু রেনেগেড মারা যাবার পরে কিছু রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। আমি একটা পাতা পড়েও ফেলেছি। খুব ভয় লেগেছে।'

ট্রয় সেই পাতাটা খুলে দেখাল ওর বাবাকে। তারপর পড়ে শোনাতে লাগল।

জানুয়ারি ৪, ১৯৪৯

ওই চোখজোড়া! টকটকে লাল চোখজোড়া প্রচণ্ড রাগে জ্বলতে থাকে। আমার শরীর অবশ হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। এমনকী চোখের পলকও ফেলতে পারি না। প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করা ওই চাউনি দেখতে চাই না বলে চোখ বুজে থাকতে চাই।

কিন্তু আমি অসহায়। ভয়ে সমস্ত শরীর অসাড়। বিছানায় শুয়ে

জানালার বাইরের ভুতুড়ে ওই চোখ দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। অথচ ওই চোখের অধিকারী নেকড়েটাকে নিজের হাতে এক হতপ্তা আগে হত্যা করেছি আমি।

কোনোই সন্দেহ নেই ওটা রেনেগেড, যদিও পুরো শরীরটা আমি দেখতে পাইনি। শুধু অপলক জ্বলন্ত চোখ জোড়া আর নেকড়ের. অস্পষ্ট একটা চেহারা ভাসতে দেখেছি মাটি থেকে ওপরে।

সে রাতে আমি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম হাড় কাঁপানো শীতে, গভীর রাতে আবির্ভাব ঘটল ভূতটার। জানি না কতক্ষণ ওটা আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে জানালার দিকে তাকাতেই ওটাকে দেখতে পাই আমি। প্রচণ্ড আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ি।

সময়ের হিসেব গুলিয়ে ফেলেছিলাম আমি। জানি না কতক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। অবশেষে নেকড়ের মুখটা হারিয়ে গেল অন্ধকারে, আমিও যেন হুঁশ ফিরে পেলাম। এখন বুঝতে পারছি রেনেগেডের প্রেতাত্মা এসেছে আমাকে ভয় দেখাতে।

'ওয়াও!' চেঁচিয়ে উঠল ট্রয়। 'এ অবিশ্বাস! তোমার চাচা কি সত্যি রেনেগেডের ভূত দেখেছিলেন?'

'হয়তো মনে মনে। দুঃস্বপ্ন কিংবা গোটা ব্যাপারটাই ছিল তাঁর কল্পনা।'

'আচ্ছা। এসো, আবার পড়া শুরু করি।'

জানুয়ারি ২২, ১৯৪৯

হিংসা আর ঘৃণায় পূর্ণ ওই চোখ জোড়া ফিরে এসেছে আবার!

এবার আর জানালার বাইরে নয়, আমার বিছানার ওপরে ভাসছে সেই কাল্পনিক মুখ!

গভীর ঘুম ভেঙে তাকাতেই দেখি সেই চোখ! অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে। সাথে সাথে জমে গেলাম আমি। রেনেগেড তার খুরের মত ধারাল দাঁত বের করে নিঃশব্দে ভেংচি কাটল যেন আমাকে। তারপর গর্জে উঠল ক্রুদ্ধ গলায়।

মনে হলো আমার ওপর হামলা করতে যাচ্ছে নেকড়েটা, কামড় বসিয়ে দেবে গলায়। কিন্তু আমি না পারছি চিৎকার দিতে না সম্ভব হচ্ছে শরীরের একটা পেশী নড়াতে। তীব্র আতঙ্কে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছি যেন। রেনেগেডের বাঁকানো থাবা আর জ্বলন্ত চক্ষু আমার কাছ থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। চাপা গলায়, হিংস্র ভঙ্গিতে গর্জে চলেছে ও।

আর সহ্য করতে পারলাম না, প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এসো! আমাকে হত্যা করো। হত্যা করে প্রতিশোধ নাও, রেনেগেড।'

ঠিক তখন সবকিছু আবার আঁধার হয়ে এল। নেমে এল নীরবতা। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো আমি আর বেঁচে নেই, মারা গেছি। চেতনা ফিরে আসতে তাকালাম জানালার দিকে। বাইরে, বরফ ঢাকা প্রেইরির ওপরে অকৃপণ হাতে নরম আলো বিলিয়ে চলেছে চাঁদ। টের পেলাম ঘামে ভিজে গেছে শরীর, ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে গা। কোন ব্যথা নেই শরীরে। আছে শুধু তীব্র ক্লান্তি আর উদ্বেগ।

বেঁচে আছি আমি, রেহাই পেয়েছি ভূতটার হাত থেকে।

ঠিক তখন দূর থেকে ভয়ঙ্কর গলায় ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। ডাকটা যেন ঢুকে গেল আমার রক্তের মধ্যে, হিম হয়ে এল গা। এই ডাক আমি চিনি। রেনেগেডের ডাক। বুঝতে

পারলাম আবার ফিরে আসবে রেনেগেডের ভূত। আসবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। তবে কখন তা জানি না।

স্কালি ডায়েরি পড়ে জানা গেল রেনেগেডের ভূত তাঁকে বছরের বিভিন্ন সময় ভয় দেখিয়েছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৫ সালে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নেকড়েটার ভূত দেখেছেন তিনি।

ডায়েরি পড়া শেষ করে বাবার দিকে তাকাল ট্রয়। 'তুমি রেনেগেডের ভূতে বিশ্বাস করো, বাবা?'

'না, ট্রয়। পৃথিবীতে ভূত বলে কিছু নেই। ভূত থাকে মনে। স্কালি চাচা রেনেগেডকে মারার পর থেকে অপরাধবোধে ভুগেছেন। তাই তার বারবার মনে হয়েছে রেনেগেডের ভূত তাঁকে ধরতে আসছে। পুরোটাই তাঁর কল্পনা। চাচার মৃত্যুর পরে আমাদের পরিবারের অনেকেই এ খামারবাড়িতে এসে থেকেছে। কই, কেউ তো ভৌতিক কিছু দেখতে বা শুনতে পায়নি।

'স্কালি চাচা ডায়েরি লিখতে পছন্দ করতেন। আমার ধারণা, অপরাধ বোধে সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন বলে ডায়েরি লেখার সময় নেকড়েটার কথা ভেবে কল্পনায় অনেক রঙ চড়িয়েছেন। বেচারীর জন্যে দুঃখই লাগে। সারাটা জীবন একটা অপরাধবোধ নিয়ে কাটিয়ে গেলেন।'

রোববার সন্ধ্যা নাগাদ ট্রয় আর তার বাবার কাজ শেষ হয়ে গেল। ওরা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে উঠে পড়ল গাড়িতে। খামার বাড়ির রাস্তা ঘুরে বড় রাস্তায় উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল ট্রয়, 'বাবা, দ্যাখো! ওটা একটা নেকড়ে না?'

ত্রিশ গজ দূরে, গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ল রূপোলি রঙের একটা নেকড়ের গায়ে। ওরা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে ছুটে যাচ্ছিল জানোয়ারটা। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল নেকড়ে। লাফ দিয়ে উঠে

পড়ল হাইওয়ের মাঝখানে। দৌড় দিল ছুটন্ত গাড়িটাকে লক্ষ্য করে।

'বাবা, সাবধান! জানোয়ারটা গাড়ির নীচে চাপা পড়বে কিন্তু!'

ট্রয়ের বাবা ব্রেক কষে, স্টিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘোরালেন বাঁ দিকে। খানিকটা স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি। 'ওহ্, নো!' চেঁচিয়ে উঠল ট্রয়। 'নেকড়েটা চাপা পড়েছে!'

ট্রাঙ্ক খুলে একটা সার্চলাইট তুলে নিলেন জ্যাক। ছেলেকে নিয়ে দৌড়ালেন যেখানে জানোয়ারটা চাপা পড়েছে ধারণা করেছেন সেদিকে। কিন্তু এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফেলেও কোনও নেকড়ে চোখে পড়ল না। নেকড়েটা বোধহয় চাপা পড়েনি।'

'অবশ্যই চাপা পড়েছে,' প্রতিবাদ করল ট্রয়। 'আমি পরিষ্কার দেখেছি। গাড়ির সামনের অংশে ধাক্কা খেয়েছে ওটা।'

গাড়ির সামনের অংশ পরীক্ষা করে দেখলেন জ্যাক। আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না। কিন্তু ফেন্ডারে রক্ত, লোম বা অন্য কিছু লেগে নেই। 'নেকেড়টা বেঁচে গেছে,' শেষে মন্তব্য করলেন জ্যাক।

এমন সময় রাতের নিস্তব্ধতা চিরে দিয়ে ডেকে উঠল একটা নেকড়ে। 'বাবা! তোমার পেছনে!' আঁতকে উঠল ট্রয়।

চরকির মত ঘুরলেন জ্যাক। হাতের টর্চের আলো সরাসরি গিয়ে পড়ল একটা নেকড়ের গায়ে। বসে আছে হাইওয়ের ধারে। জানোয়ারটার গায়ের চামড়া যেন চকচকে রূপো। গলায় ব্রোঞ্জের রিং। লেজটা কালো, ঘন লোমে ঢাকা।

ডাক বন্ধ করল নেকড়ে, তারপর আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ট্রয় আর জ্যাকের দিকে। লাল টকটকে চোখ! আর কী ভয়ানক চাউনি!

'ওর চোখ, বাবা! আগুনের মত জ্বলছে দেখো!'

'হ্যাঁ। আর একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগছে। লক্ষ করেছিস ওটার কোনও ছায়া পড়েনি মাটিতে? আলোটা যেন সোজা ওর শরীর ভেদ করে যাচ্ছে।'

ওদের দিক থেকে মাথা ঘুরিয়ে নিল নেকড়ে, তারপর করুণ সুরে পরপর কয়েকটা ডাক দিল। শেষে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

নেকড়েটা যেখানে বসে ডাকছিল ওখানটাতে চলে এল ট্রয় আর তার বাবা। নরম মাটিতে নেকড়ের পায়ের ছাপ পড়েছে।

'থাবাগুলো দ্যাখো!' উত্তেজিত গলায় বলল ট্রয়। 'সামনের থাবায় ছ'টা আর পেছনেরটাতে তিনটা আঙুল! বাবা, এই মাত্র আমরা রেনেগেডের ভূতকে দেখেছি!'

মন্দিরের পিশাচ

অনেক অনেক দিন আগে গৌরীদাসপুর নামে উত্তর বঙ্গের ছোট একটি গাঁয়ে বাস করত এক গরীব চাষা এবং তার বউ। তারা দু'জনেই ছিল বেজায় ভালমানুষ। তাদের অনেকগুলো বাচ্চা ফলে এতগুলো মানুষের ভরণপোষণ করতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠে যেত চাষার। বড় ছেলেটির বয়স যখন চোদ্দ, গায়ে-গতরে বেশ বলিষ্ঠ, সে বাপকে কৃষি কাজে সাহায্য করতে নেমে পড়ল। আর ছোট মেয়েগুলো হাঁটতে শেখার পরপরই মাকে ঘরকন্নার কাজে সহযোগিতা করতে লাগল।

তবে চাষী-দম্পতির সবচেয়ে ছোট ছেলেটি কোনও শক্ত কাজ করতে পারত না। তার মাথায় ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি—সে তার সবগুলো ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে চালাক ছিল কিন্তু খুব দুর্বল শরীর এবং দেখতে নিতান্তই ছোটখাট ছিল বলে লোকে বলত ওকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। কোনও কাজেই লাগবে না সে। বাবা-মা ভাবল কৃষিকাজের মত শক্ত কাজ করা যেহেতু ছোট ছেলের পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই ওকে পুরোহিতের কাজে লাগিয়ে দেয়া যাক। বাবা-মা একদিন ছোট ছেলেকে নিয়ে গাঁয়ের মন্দিরে চলে এল। বুড়ো পুরোহিতকে অনুনয় করল, তিনি যেন তাদের ছেলেটিকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ওকে পড়ালেখা শেখান। যাতে বড় হয়ে সে মন্দিরে যজমানি (পুরোহিতগিরি)

করতে পারে।

বৃদ্ধ ছোট ছেলেটির সঙ্গে সদয় আচরণ করলেন। তাকে কিছু কঠিন প্রশ্ন করা হলো। ছেলেটি এমন চতুর জবাব দিল যে তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে কোনওই আপত্তি করলেন না ধর্মগুরু। তিনি ওকে মন্দিরের টোলে ভর্তি করে দিলেন। ওখানে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হত।

বৃদ্ধ পুরোহিত ছেলেটিকে যা শেখালেন, সবকিছু দ্রুত শিখে নিল সে। সে গুরুর অত্যন্ত বাধ্যগত ছাত্র। তবে তার একটা দোষ ছিল। সে পড়ার সময় ছবি আঁকত। এবং তার ছবির বিষয়বস্তু ছিল বেড়াল। ওই সময় মন্দিরে বেড়ালের ছবি আঁকার ব্যাপারে নিষেধ ছিল।

একা যখন থাকত ছেলেটি, তখনই এঁকে ফেলত বেড়ালের ছবি। সে ধর্মগুরুর ধর্মীয় বইয়ের মার্জিনে ছবি আঁকত, মন্দিরের সমস্ত পর্দা, দেয়াল এবং পিলারগুলো ভরে গিয়েছিল বেড়ালের ছবিতে। পুরোহিত বহুবার তাকে এসব ছবি আঁকতে মানা করেছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটি ছবি আঁকত কারণ না এঁকে পারত না। ছবি না আঁকলে কেমন অস্থির লাগত তার। সে ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন চিত্রকর। ছবি এঁকেই একদিন নাম কামানোর স্বপ্ন দেখত ছেলেটি। এ জন্য ধর্ম শিক্ষায় মন দিতে পারত না। ভাল ছাত্র হবার খায়েশও তার ছিল না। ভাল ছাত্র হতে হলে বই পড়তে হয়। কিন্তু পড়ার চেয়ে আঁকাআঁকিই তাকে টানত বেশি।

একদিন দেবী দুর্গার শাড়িতে বেড়ালের ছবি আঁকতে গিয়ে ধর্মগুরুর কাছে হাতেনাতে ধরা খেল ছেলেটি। বুড়ো খুবই রেগে গেলেন। বললেন, 'তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও। তুমি কোনওদিনও পুরোহিত হতে পারবে না। তবে চেষ্টা করলে

একদিন হয়তো বড় মাপের চিত্রকর হতে পারবে। তোমাকে শেষ একটি উপদেশ দিই শোনো। উপদেশটি কখনও ভুলো না। রাতের বেলা বড় জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোট জায়গায়!'

গুরুর এ কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না ছেলেটি। এ কথার মানে ভাবতে ভাবতে সে তার ছোট বোঁচকা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মন্দির থেকে। গুরুকে তাঁর কথার অর্থ জিজ্ঞেস করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ধমক খাওয়ার ভয়ে প্রশ্ন করল না। শুধু 'বিদায়' বলতে পারল।

মনে দুঃখ নিয়ে মন্দির ছেড়েছে ছেলেটি। কোথায় যাবে, কী করবে বুঝতে পারছে না। যদি বাড়ি যায়, পুরোহিতের কথা না শোনার অভিযোগে বাপ ওকে বেদম পিটুনি দেবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই বাড়ি যাওয়ার চিন্তা নাকচ করে দিল সে। হঠাৎ পাশের বাড়ির গাঁয়ের কথা মনে পড়ল। এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে। ওই গাঁয়ে বিশাল একটি মন্দির আছে। মন্দিরের তরুণ-বুড়ো অনেক পুরোহিত আছেন। ছেলেটি শুনেছে ওখানেও একটি টোল আছে। সেখানে ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয়। সে ঠিক করল ওই গাঁয়ে যাবে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হাতে-পায়ে ধরে বসবে তাকে টোলে ভর্তি করানোর জন্য। ওর কাতর অনুরোধ নিশ্চয় ফেলতে পারবেন না ঠাকুর মশাই।

কিন্তু ছেলেটি জানত না বড় মন্দিরটি বহু আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ওখানে একটা পিশাচ এসে আস্তানা গেড়েছে। পিশাচের ভয়ে পুরোহিতরা অনেক আগেই মন্দির ছেড়ে পালিয়েছেন। গাঁয়ের ক'জন সাহসী মানুষ পিশাচটাকে মারতে গিয়েছিল। তারা এক রাতে ছিল ওই মন্দিরে। কিন্তু পরদিন কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি। তাদের রক্তাক্ত, খাবলানো শরীর পড়ে ছিল মন্দিরের চাতালে। তারপর থেকে ভুলেও কেউ ওই মন্দিরের ছায়া মাড়ায়

না। পরিত্যক্ত মন্দিরটি এখন হানাবাড়িতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এসব কথা তো আর ছেলেটি জানত না। সে মন্দিরের টোলে ভর্তি হবার আশায় পথ চলতে লাগল।

চার ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে গাঁয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা নেমে এল। গ্রামের মানুষ এমনিতেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, মন্দিরে পিশাচের হামলা হবার পর থেকে তারা সূর্য পশ্চিমে ডুব না দিতেই ঘরের দরজা এঁটে, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। আর মন্দির থেকে ভেসে আসা বিকট, বীভৎস সব চিৎকার শুনে শিউরে শিউরে ওঠে।

মন্দিরটি গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, একটি টিলার ওপরে। ছেলেটি মন্দিরে আলো জ্বলতে দেখল। ভুতুড়ে মন্দিরে কেউ পুজো দিতেই যায় না, আলো জ্বালা দূরে থাক। তবে লোকে বলে পিশাচটা নাকি সাঁঝবেলা আলো জ্বেলে রাখে পথ ভোলা পথচারীদের আকৃষ্ট করার জন্য। আলোর হাতছানিতে দূর গাঁ থেকে আসা মুসাফির আশ্রয়ের খোঁজে মন্দিরে ঢুকলেই পিশাচের শিকার হয়।

ছেলেটি মন্দিরের বিশাল, কারুকাজ করা পুরু কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াল। আঙুলের গাঁট দিয়ে টুক টুক শব্দ করল। কেউ সাড়া দিল না। আবার নক্ করল সে। জবাব নেই। মন্দিরের সবাই এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! অবাক হয় ছেলেটি। একটু ইতস্তত করে দরজায় ধাক্কা দিল সে। ক্যাআআচ শব্দে মেলে গেল কপাট। ভেতরে ঢুকল ছেলেটি। মাটির একটি প্রদীপ জ্বলছে কেবল। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছেলেটি ভাবল কেউ না কেউ নিশ্চয় আসবে। সে মেঝেতে বসে পড়ল। অপেক্ষা করছে। ছেলেটি লক্ষ করল মন্দিরের সব কিছুই ধুলোয় ধূসর হয়ে আছে। মাকড়সার জালে ছেয়ে গেছে প্রায় পুরোটা জায়গা। বোঝাই যায় অনেক দিন ঝাঁট পড়েনি।

হয়তো ঝাঁট দেয়ার লোক নেই। ছেলেটি মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠল তাকে ঠাকুর মশাই শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন ভেবে। কারণ ঘর ঝাঁট দেয়ার জন্য হলেও তো ওদের একজন লোক লাগবে।

জানালায় বড় বড় সাদা পর্দা ঝুলতে দেখে খুশি হয়ে গেল ছেলেটি। বাহ্, ছবি আঁকার চমৎকার ক্যানভাস পাওয়া গেছে। রঙ পেন্সিলের বাক্স সে সঙ্গেই নিয়ে এসেছে। দ্বিরুক্তি না করে বেড়ালের ছবি আঁকতে বসে গেল।

পর্দাগুলো ভরে ফেলল সে বড় বড় বেড়ালের ছবিতে। পথ চলার ক্লান্তিতে তার ঘুম এসে গেল। সে পুঁটুলি খুলে চাদর বিছিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়ার তোড়জোর করছিল, এমন সময় মনে পড়ে গেল ধর্মগুরুর কথা: *রাতের বেলা বড় জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোট জায়গায়!*

মন্দিরটি প্রকাণ্ড; আর সে একা। গুরুর কথাগুলো মনে পড়তে, অর্থ না বুঝলেও, এবার তার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে ঘুমাবার জন্য ছোট ঘর খুঁজতে লাগল। ক্ষুদ্র একটি কুঠুরিও পেয়ে গেল। কুঠুরির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তারপর ছিটকিনি লাগিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল।

গভীর রাতে ভয়ংকর একটা শব্দে জেগে গেল সে। মারামারি করছে কারা যেন। ফ্যাঁচফ্যাঁচ, অপার্থিব আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জান্তব চিৎকার। এমন ভয় পেল ছেলেটি, দরজার ফাঁক দিয়েও মন্দিরের ভেতরে তাকাতে সাহস পেল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল তাকালেই এমন ভয়াবহ কিছু একটা সে দেখবে যে হার্টফেল হয়ে যাবে। সে মেঝেতে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল। নিশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে।

আলোর যে সূক্ষ্ম রেখা ঢুকছিল দরজার হিলকা দিয়ে তা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেটি বুঝতে পারল নিভে গেছে মন্দিরের বাতি। নিকষ আঁধারে ডুবে গেল ঘর। তবে ভীতিকর শব্দগুলো চলল বিরতিহীন। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের আওয়াজ, রক্ত হিম করা গলায় কে যেন আর্তনাদ করে উঠছে মাঝে মাঝে। গোটা মন্দির থরথর করে কাঁপছে। বোঝা যাচ্ছে দরজার বাইরে মরণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠেছে দুটি পক্ষ। অনেকক্ষণ পরে নেমে এল নীরবতা। কিন্তু ছেলেটি ভয়ে নড়ল না এক চুল। অবশেষে ভোর হলো। সোনালি আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে।

লুকানো জায়গা থেকে খুব সাবধানে বেরিয়ে এল ছেলেটি। তাকাল চারদিকে। দেখল মন্দিরের মেঝেতে রক্ত আর রক্ত! রক্তের পুকুরের মাঝখানে মরে পড়ে আছে গরুর চেয়েও আকারে বড় একটি দৈত্যাকার ইঁদুর। মন্দিরের পিশাচ!

কিন্তু এটাকে হত্যা করল কে? মানুষজন কিংবা অন্য কোনও প্রাণী দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ ছেলেটি লক্ষ করল সে গতরাতে পর্দায় যে সব বেড়ালের ছবি এঁকেছে, সবগুলো বেড়ালের গায়ে রক্ত মাখা! সে তক্ষুনি বুঝতে পারল পিশাচ ইঁদুরটাকে তারই আঁকা বেড়ালরা হত্যা করেছে। এবং এখন সে বুঝতে পারল বৃদ্ধ পুরোহিতের সেই সাবধান বাণীর মানে–*রাতের বেলা বড় জায়গা এড়িয়ে চলবে; ঘুমাবে ছোট জায়গায়।*

ওই ছেলেটি বড় হয়ে খুব বিখ্যাত চিত্রকর হয়েছিল। আর তার আঁকা বেড়ালের সেই ছবিগুলো এখনও ওই মন্দিরে আছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে ওই গাঁয়ে গিয়ে দেখে আসুন। গৌরীদাসপুর থেকে মাত্র চার ক্রোশ রাস্তা–টিলার ওপরে মন্দিরটা সহজেই চোখে পড়ে!

পরিবার

‘ডেভিড বোধহয় সত্যি মেয়েটাকে ভালবাসে,’ বলল মা ইতস্তত ভঙ্গিতে। ‘আমাদের ছেলেকে আমরা অসুখী করতে চাই না, সবাই জান।’

মাথাটা ঝট করে পেছন দিকে হেলে গেল পেটের, হেসে উঠল। ওর লম্বা, ধারাল দাঁত ঝিকিয়ে উঠল আলোতে। ‘অবশ্যই ভালবাসে,’ কর্কশ শোনাল কণ্ঠ। ‘দারুণ ভালবাসে। নইলে মেয়েটাকে সে বিয়ে করতে চাইবে কেন?’ ওর শেষ কথাটা যেন সিলিং-এ ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

‘ডেভিড আমাদের জন্য অনেক করেছে,’ মন্তব্য করল ল্যান্সলট। ‘আমাদের মধ্যে একমাত্র ও-ই একদিনের বেশি সময় বাইরে কাটানোর হিম্মত দেখিয়েছে। ওর এমন কিছু গুণ আছে যা দেখে মেয়েরা সহজেই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ও যা-ই করুক সব আমাদের জন্যই করে।’

‘কিন্তু ও যদি মেয়েটাকে সত্যি ভালবাসে... পুনরাবৃত্তি করল মা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিজের সবুজ শিরা জেগে ওঠা হাতের দিকে, ‘সত্যি যদি ও...’

এবার ডেভিডের কথা বলার পালা। ‘হ্যাঁ, ওকে আমি পছন্দ করি। একথা সত্যি।’ স্বীকার করল সে। ‘অন্য যে কারও চেয়ে ওকে বেশি ভালবাসি আমি। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? ল্যান্স

তো বললই আমি যাই করি না কেন সবই পরিবারের সুখ চেয়ে।'

'তুমি সত্যি ভাল, ডেভিড,' হাসল মা। তোমাকে ছাড়া আমরা চলতাম কীভাবে? বছরের পর বছর তুমি আমাদের রসদ যুগিয়ে চলেছ।'

প্রত্যেকেই সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেভিডের চেহারা।

'আবার কোনও সমস্যা হবে না তো?' হঠাৎ উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করে বসল মিনা। 'দু'বছর আগের ঘটনার কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাওনি।'

'না, না,' জবাব দিল ডেভিড।

'ডেভিড ঠিক থাকলে কোনও সমস্যাই হবে না,' বলল কেট। 'ডেভিড খুব চালাক। ওর ওপর সহজেই বিশ্বাস রাখা যায়।' ডেভিডকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল সে। ভাইকে খুব ভালবাসে সে। ডেভিডও কেট বলতে অজ্ঞান। 'ও আসছে কবে?' চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে জানতে চাইল মা।

'কাল রাতে।' জবাব এল।

সবচে' দুশ্চিন্তার সময় হলো ঘরে প্রবেশ করার মুহূর্তটি। মা যতই ধোয়ামোছা করুক, ওটার গা থেকে অদ্ভুত গন্ধটা কখনও যাবে না। বছর দুই আগে সেই মেয়েটা ঘরে ঢুকেই নাক সিটকে বলেছিল বিশ্রী একটা গন্ধ পাচ্ছে সে। তবে ইলেন এ বাড়িতে যেবার প্রথম এল, তার চেহারায় বিরক্তির ভাঁজ পর্যন্ত পড়তে দেখেনি ডেভিড। বাড়িটি সম্ভবত পছন্দ হয়েছে ওর।

'ইলেনকে তুমি পোশাক পরাবে,' সিঁড়িতে উঠে কেটকে বলল ডেভিড। 'ইলেন তোমাকে খুব পছন্দ করেছে। বলেছে তোমার চোখ দু'টি ভারি সুন্দর।'

'ওকে আমারও খুব পছন্দ হয়েছে,' বলল কেট।

সেলারে সব কিছু রেডি অবস্থায় আছে। কালো দাগঅলা বেদি, কালো পর্দা, কালো বড় বাটি। সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে। কোথাও ছন্দপতনের চিহ্ন নেই। ওই মেয়েটা ধর্মকর্ম করত না। তবে ইলেনের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটবে না বলেই ডেভিডের বিশ্বাস।

ইলেন সাজুগুজু করে চলে এল সন্ধ্যাবেলায়। খুব মজা করে ডিনার করল সবার সঙ্গে, মদ পান করল, ল্যান্সলটের চুটকি শুনে হি হি করে হাসল। সত্যি সুন্দরী ইলেন। হাতির দাঁতের মত শুভ্র তার বাহু। কালো পোশাক ফর্সা শরীরে দারুণ মানিয়ে গেছে। মুখখানা যেন গাঢ় মদ, মাথার ওপর কালো চুল স্যাটিনের মত ঝলমলে।

ডিনার পরিবেশন করছিল কেট, মজার মজার গল্প করছিল ইলেনের সঙ্গে।

অবশেষে এল মাহেন্দ্র ক্ষণ। মা ছেলেকে বলল তাদের ভবিষ্যৎ পুত্র বধূকে সেলার থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে। কিন্তু ইলেন শাশুড়ি ছাড়া যাবে না।

সেলারের সিঁড়ি গত বছর মেরামত করা হয়েছে; তাই বিশ্রী ক্যাঁচম্যাচ শব্দটা আর নেই। মা আগে আগে চলল, পেছনে ইলেন। তার পেছনে পরিবারের অন্যান্যরা।

সিঁড়ির শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ইলেন। এ জায়গায় দু'বছর আগে সেই মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, পালাবার চেষ্টা করেছিল। সে এক কেলেংকারী কাণ্ড। কিন্তু ইলেন সেলার দেখে মুগ্ধ। ভয় তো পেলই না, বরং বলল, 'ডেভিড, সবকিছু কী সুন্দরভাবে জোগাড় করেছ তুমি?'

কথা বলার আগে কি ইলেনের চোখ জোড়া সামান্য বিস্ফারিত

হয়ে উঠেছিল?

ইলেনের আচরণে অবাক ডেভিড। ইলেনের বলার ঢঙেও রাজকীয় ভঙ্গিমা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে গর্বের ভঙ্গিতে। বাদুড়ের মত চোখ জ্বলছে। মাংস পচা গন্ধটা কি আদৌ নাকে বাধছে না ইলেনের, নাকি চেপে যাবার চেষ্টা করছে?

বেদির দিকে পা বাড়াল ইলেন। পেছন থেকে অন্যরা ধাক্কা দিল ডেভিডকে। কাজটা ঠিকঠাক ভাবে করা চাই—এটা তারই ইঙ্গিত।

হঠাৎ স্তোত্র পাঠ শুরু হলো। ইলেন কাঁধ থেকে ওড়না ফেলে দিল মাটিতে। কালো মোমবাতির আলোয় স্ফটিকের মত জ্বলছে তার ত্বক, পিঠের চুল ছেড়ে দিল ইলেন, মৃদু গুঙিয়ে উঠল।

অপূর্ব লাগছে ইলেনকে। এই ইলেনকে ডেভিড ভালবেসেছে। সবাই তাকে ভালবেসেছে। হঠাৎ তীব্র আবেগের বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেল ডেভিডকে।

মন্ত্রোচ্চারণ আরও জোরাল হয়ে উঠল। এবার সময় হয়েছে। আড়ষ্ট ভঙ্গি ডেভিডের, অথচ আসল কাজটা ওকেই করতে হবে। আবেগের সাগরে যেন ক্রমে তলিয়ে যাচ্ছে ডেভিড। কিন্তু মরিয়া হয়ে মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিল সে। তারপর ছুরিটা তুলল মাথার ওপর। 'হাঁটু গেড়ে বসো।' আদেশ করল সে ইলেনকে। কিন্তু ইলেন বসল না। মৃদু হাসল সে, আলগোছে ডেভিডের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ছুরিটি।

কেউ কি হাঁপিয়ে উঠল? না, কেউ কোন শব্দ করেনি। সবচে' অবাক ব্যাপার। সম্মোহিতের মত ডেভিড নিজেই যখন হাঁটু গেড়ে বসেছে, তখনও মন্ত্রোচ্চারণ সমানে চলেছে।

ইলেন তার গলায় ছুরিটি ঠেকাল।

অবাক হবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে ডেভিড। তবে এ

ঘটনার জন্যে তার কোন আফসোস হচ্ছে না। সে যা করেছে সব পরিবারের জন্যে। বছরের পর বছর পরিবারের জন্যে মেয়ে যুগিয়ে চলেছে সে। তাদেরকে বেদিতে উৎসর্গ করা হয়েছে। আজ রাতে সে নিজেই উৎসর্গিত হতে চলেছে। পরিবারের মনে হয়তো এ-ই ছিল।

ইলেনের ছুরির চাপ বাড়ল গলায়। চোখ বুজল ডেভিড।

ছবি

দেয়ালে তার ছবিগুলো টাঙানো। তার অহঙ্কার এবং আনন্দ। তার একমাত্র গর্ব এবং অন্তত আজ রাত পর্যন্ত একান্ত আনন্দ।

রিছানার ওপর তার জামা কাপড় পড়ে আছে। ওগুলো অন্যের কাছে কোন গুরুত্বই বহন করবে না। তাদের কাছে লাল টাই, সাদা শার্ট এবং গাঢ় সবুজ রঙের ট্রাউজার, সাধারণ টাই, শার্ট আর ট্রাউজারই মনে হবে। কিন্তু একমাত্র সে জানে ওগুলোর গুরুত্ব কতখানি। সে কয়েক মাস আগে কাপড়গুলো কিনেছে আজকের রাতটির জন্যে। এখনও ওগুলো পরেনি, এমনকী ভাঁজ পর্যন্ত খোলেনি। সময়ের সাথে সাথে সে বুঝতে শিখেছে অপেক্ষা বা ধৈর্য অনেক সাফল্য এনে দিতে পারে।

আজ সকাল থেকে সে উত্তেজিত হয়ে আছে, সন্ধ্যার কথা ভাবলেই শিহরণ জাগছে, প্রতি শনিবারের মত আজকের দিনটাও গতানুগতিক কাটছে তার, আরেকটি ছবি এঁকেছে, সেটের সব শেষ ছবিটি, সেই সেট যা তার অপেক্ষা এবং ধৈর্যের ফল। নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপারটি সবসময়ই তার কাছে কঠিন মনে হত। তবে তার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে ফুটে উঠেছে নিজের বিভিন্ন অভিব্যক্তি–যন্ত্রণা, হতাশা, ঘৃণা।

গোসল করার পর শরীর ঠাণ্ডা লাগছে তার। সে রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। এই প্রথম হাতে ঘড়ি পরেছে সে। আরও ঘণ্টা

খানেক পর তার অপেক্ষার অবসান ঘটবে।

পোশাক পরার আগে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল সে, জোর করে তাকাল নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। তাকে দেখার মত কিছু নেই। মাঝারী উচ্চতা তার, সামান্য মুটিয়ে গেছে, পরিষ্কার বোঝা যায় আনফিট একটা শরীর। স্রেফ একটা শরীর। আর কিছু নয়।

নিজের মুখখানা দেখল সে এবার। চেহারা দেখেই একজনকে বোঝা যায়। আর এ ব্যাপারটাই তাকে মর্মাহত করে তোলে। কারণ কেউ কোনওদিন তার দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায়নি। জানে না তার অপরাধ কী, তার চেহারা এমন অনাকর্ষণীয় কেন। তার যা আছে, অন্য সবারও তাই আছে, তা হলে মেয়েরা কেন তার দিকে ফিরে দেখে না? কেন এমন ভাব করে যে তার কোন অস্তিত্ব নেই?

সে জুলির প্রেমে পড়েছিল। ছয় মাসে সে প্রথম মেয়েটাকে দেখে তার অফিসে। চোখে চোখ পড়তে মনে হয়েছিল ওই ঘরে জুলি ছাড়া কেউ নেই, অন্য সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। প্রথম দর্শনে যাকে বলে প্রেম ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল তার বেলায়।

কিন্তু সে কিছু বলার আগেই জুলির অফিস কলিগরা মেয়েটিকে ঘিরে ফেলে। সেই কলিগরা, যাদের ছবি ঝুলে আছে দেয়ালে। অবশ্য এরা সকলেই ছিল সুদর্শন, জীবন্ত, তাদের কাছে সে পাত্তা পাবে কী করে? জুলির সাথে তার আর দেখা হয়নি।

ভেজা শরীর শুকিয়ে গেছে ফ্যানের বাতাসে, সে শার্টের ভাঁজ খুলে সাবধানে ওটা গায়ে চড়াল, বোতাম আটকাল। ধবধবে সাদা শার্ট, হয়তো আজ রাতে কেউ তার শার্ট আবার খুলে দেবেঃ তাকে আগের মত আর হতাশ হতে হবে না। দেখা যাক কী হয়।

আন্ডার ক্লথ পরে জুতো পালিশ করার সময় তার চোখের সামনে ভেসে উঠল অফিস কলিগের চেহারা। ওরা মোট তিনজন।

প্রথমজনের নাম রায়হান, লম্বা, হ্যান্ডসাম। দ্বিতীয়জন জহির, সর্বশেষ জাফর। এদের তিনজনকে নিয়েই সে এবার তার প্রধান চিত্রকর্মটি এঁকেছে। এদের ছবি দেখাতে জুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে। জুলি আসবে বলেছে।

ট্রাউজার পরল সে। কিনারাগুলো ধারাল। ট্রাউজারের রংটা তার খুব পছন্দ হয়েছে।

চুল শুকিয়ে গেছে, চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াল সে। মুখ তুলে চাইল আয়নায়। মন্দ লাগছে না দেখতে। গত ক'টা মাস নির্ঘুম অনেকগুলো রাত কেটেছে তার। অনেক ঝড় ঝাপটা সইতে হয়েছে। তারপরও সে অপেক্ষায় থেকেছে আজকের রাতটির জন্যে।

দেয়ালের দিকে তাকাল সে। দেয়ালে ঝোলানো তিনটা মুখ। হাত বাড়াল সে। পুরানো কলিগদের গা ছুঁলো। রায়হানের মুখখানা স্কালপেন দিয়ে ফালি ফালি করে কেটেছে সে। তারপর কপাল এবং চিবুকে পেরেক মেরে আটকে দিয়েছে দেয়ালে। তার পাশে জহির। কুড়োলের এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা করে ফেলেছে সে, খুলি থেকে চামড়া ছিলেছে, তারপর দেয়ালের সাথে পেরেক মেরে দিয়েছে। সবশেষে জাফর। তার মুখটাকে তিন খণ্ড করা হয়েছে। এক সারিতে মুণ্ডগুলো ঝুলিয়ে রাখা। এদের তিনজনকেই বিভিন্ন সময় অপহরণ করতে হয়েছে তাকে শক্তি এবং কৌশল প্রয়োগ করে। তারপর তাদের ছবি এঁকেছে সে। আর এই ছবিই জুলিকে দেখাতে চায় সে।

বেজে উঠল ডোরবেল। অপেক্ষার পালা শেষ। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে। জুলি এসেছে। জুলিকে দিয়ে সে চার নম্বর ছবিটি আঁকবে।

সে

সকাল। জন ও রুর্ক শহরের ব্যস্ত এলাকার রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। বিভ্রান্ত চোখে দোকানপাট, গাড়ি-ঘোড়ার দিকে তাকাচ্ছে। বুঝতে পারছে না সে এখানে কেন এসেছে এবং যাচ্ছে কোথায়। যেন এই মাত্র স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এসেছে জন, ঢুকেছে বাস্তব দুনিয়ায়।

রাস্তার মোড়ে এসে দাড়াল জন। তাকাল মাথার ওপরে সকালের উজ্জ্বল সূর্যের দিকে। রোদে ধাঁধিয়ে গেল চোখ, মাথায় খচ করে বিঁধল তীক্ষ্ণ ব্যথার ছুরি। কপালের ওপর হাত রেখে আলোটা আড়াল করল, লক্ষ্য করল হাতে লাল ফুটকি লেগে আছে। অদ্ভুত তো, ভাবল জন, ফুটকিগুলো যেন শুকিয়ে যাওয়া রক্তবিন্দু।

হঠাৎ খুব দুর্বল লাগল জনের, বসে পড়ল ফুটপাতে। ওর কী হয়েছে ভাবার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড পরে একটা গাড়ি হুশ করে পাশ কাটাল ওর। আরেকটু হলে ধাক্কা খাচ্ছিল। ঝট করে পেছন দিকে হেলে গেল জন, লাফ মেরে সিধে হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু শরীরে এমন ব্যথা, খাড়া হতে রীতিমত কসরৎ করতে হলো। কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়ল জন, লক্ষ করল সে তার সেরা সুট এবং জুতো পরে আছে। কোটের আস্তিন গোটাল সময় দেখতে। কিন্তু কব্জিতে ঘড়ি নেই। আশ্চর্য তো! জন ও রুর্ক

কখনোই ঘড়ি খোলে না, এমনকী ঘুমাবার সময়ও না। একটু পরপর সময় দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

নিজেকে ওর মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে। শহরের মাঝখানে সে করছেটা কী? এখন ক'টা বাজে? উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল জন। সামনে, ফুটপাতে এক মহিলাকে দেখে চিনতে পারল ও। তার অফিসে কাজ করে মহিলা। মহিলার পেছনে হেঁটে গেল জন, টোকা দিল কাঁধে।

'মাফ করবেন, মিসেস এন্ডারসন, এখন ক'টা বাজে বলতে পারবেন? আমার ঘড়ি নেই সঙ্গে।'

ওর কণ্ঠ শুনে পাঁই করে ঘুরল মহিলা। জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। তারপর আর্তচিৎকার দিয়েই ছুটল সে।

ফুটপাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল জন। দেখছে পলায়নপর মহিলাকে। মহিলা ওকে দেখে এমন ভয় পেল কেন বুঝতে পারছে না। ওর চেহারায় কি ভীতিকর কোনও ব্যাপার আছে? মুখে হাত বুলাল জন। কপালটা আলুর মত ফুলে আছে। আবার হাতে লাল ফুটকি দেখতে পেল ও।

ঘুরল জন। চলল ফুটপাত ঘেঁষা বড় কাচের জানালাঅলা দোকানের দিকে। জানালার কাচে ওর প্রতিবিম্ব ফুটল। সকালের আলোয় ভূতুড়ে লাগল। জনের কপালে একটা অদ্ভুত দাগ, মুখখানা কাগজের মত সাদা, পরনের শার্ট কোঁচকানো।

জন রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। বাসায় যাচ্ছে। ওখানে সে দুই বেডরুমের ছোট্ট একটি বাড়িতে থাকে সস্ত্রীক। ওদের সন্তান নেই। কারণ জন কখনোই বাবা হতে চায়নি। সন্তান মানেই ঝামেলা, কাজে বাধার দৃষ্টি। এজন্য জন বাচ্চা কাচ্চা নিতে দেয়নি তার স্ত্রীকে। কাজে দেরী হওয়া সে মোটেই সহ্য করতে

পারে না।

এখন, কী কারণে জানে না জন, মনে হচ্ছে খুব জরুরী একটা কাজে দেরী হয়ে যাচ্ছে তার। ওর স্ত্রী বলতে পারবে কাজটা কী। সে জনের জন্য সুস্বাদু, গরম নাস্তা নিয়ে অপেক্ষা করছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো একটুও খিদে লাগছে না জনের।

এমন সময় একটা বাস ওর পাশ কাটাচ্ছে, জানালায় তাকাল জন। দেখল ওর দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ওদের পড়শীর ছোট মেয়ে লুসি পটার। জন মেয়েটিকে লক্ষ্য করে হাত তুলল। মুখ হাঁ হয়ে গেল লুসির, তবে সে হাসছে নাকি চিৎকার করছে ঠিক বুঝতে পারল না জন। তবে বাসের জানালায় সবক'টা বাচ্চা যে ওর দিকে ভয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে তা বেশ বুঝতে পারল জন। সে ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল। চলে গেল বাস।

জনের পা আর চলতে চাইছে না। যদি কোনও সহৃদয় ড্রাইভার পেত তাকে অনুরোধ করত বাড়ি পৌঁছে দিতে। রাস্তার মোড়ে একটা স্টপলাইটে হেলান দিল জন, তাকাল রাস্তায়। দূর থেকে একটি গাড়ি আসছে। উজ্জ্বল, হলুদ রঙের। গাড়িটি দেখেই চিনতে পারল জন। ওর সেক্রেটারির গাড়ি। মেরুদণ্ড টান টান করল জন, হাত নাড়তে লাগল। স্পটলাইটের বাতি জ্বলে উঠল লাল হয়ে। থেমে গেল গাড়ি। কিন্তু জনের সেক্রেটারি মিস স্পেন্সার তার বসকে লক্ষ করেনি। গাড়ি থামার ফাঁকে সে রূপচর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে। জন হেঁটে গাড়ির পাশে চলে এল, প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা খোলার চেষ্টা করল। বন্ধ। জানালায় আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিল সে। উঁকি দিল মিস স্পেন্সারের দিকে। ফিরে চাইল সেক্রেটারি। নির্জলা আতংক ফুটল তার চেহারায় স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরল

সে, চাপ দিল গ্যাস পেডালে। ট্রাফিকের বাতি তখনও সবুজ হয়নি, কিন্তু গাড়ি নিয়ে ঝড়ের বেগে সামনে বাড়ল মিস স্পেন্সার। ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল জন।

অফিসে ফিরেই মিস স্পেন্সারের চাকরি নট করে দেবে, কসম খেল জন। উঠে পড়ল রাস্তা থেকে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে এল ফুটপাতে। তীব্র যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চাইছে মাথা। হাত কাঁপছে। চামড়াটা বিবর্ণ, ফ্যাকাসে এবং শুকনো।

টলতে টলতে একটা দোকানের সামনে চলে এল জন ও রুর্ক। তাকাল আয়নায়। তার গর্তে ঢোকা চোখের চারপাশে গভীর কালি, ঠোঁট জোড়া রক্তশূন্য, হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু নড়ল না ঠোঁট। কপালের নীল ক্ষতটার মতই নীলচে ওর গায়ের চামড়া।

একটা ভয় গ্রাস করল জনকে, আতংক ঘিরে ধরল। কাজে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। যার সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করা হোক না কেন মিস করা যাবে না কিছুতেই।

আয়নায় একটা ফোন বুদের প্রতিবিম্ব ফুটে আছে। ওই তো জবাব পাওয়া গেছে। জন তার স্ত্রীকে ফোন করবে। বলবে এখানে এসে তাকে নিয়ে যেতে। স্ত্রী ক্যালেন্ডার চেক করে দেখলেই বুঝতে পারবে কার সঙ্গে কাজের শিডিউল আছে তার স্বামীর।

আড়ষ্ট পা নিয়ে ঘুরল জন, চলল ফোন বুদের দিকে। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। এক মুহূর্তের জন্য ক্লস্ট্রফোবিয়ায় আক্রান্ত হলো সে। মনে হলো বন্ধ ফোন বুদ তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। বুদটি এত সরু, কফিনের মত।

কয়েনের জন্য পকেট হাতড়াল জন। খালি। মেঝেতে চকচক

করে উঠল কী যেন। ঝুঁকল জন। একটা মুদ্রা। ফোন করতে আসা কারও পকেট থেকে পড়ে গেছে নিশ্চয়। সে কয়েনটা স্লটে ঢোকাল। বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করল।

প্রথম রিংটা মনে হলো অনেক দূর থেকে হচ্ছে। জনের নিশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। ছোট ফোন বুদে বাতাসই যেন ঢুকছে না। দ্বিতীয় রিং হলো। জনের স্ত্রী দ্বিতীয় রিং হবার পরে সাধারণত ফোন ধরে। কিন্তু সে ফোন ধরছে না।

ফোন বুদে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না জন। সে দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়াল। এমন সময় ফোন লাইনের অপর পাশে ক্লিক করে শব্দ হলো। কেউ তুলেছে রিসিভার। অচেনা নারী কণ্ঠ সাড়া দিল। 'হ্যালো?'

'আ...ইয়ে মিসেস রুরর্ক আছেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল জন।

মহিলা চুপ করে থাকল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর জবাব দিল, 'জ্বী না। মিসেস রুরর্ক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে গেছেন। আপনি জানেন না? তাঁর স্বামী দুইদিন আগে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।'

মহিলা বকবক করে আরও কী সব বলছে, কানে গেল না জনের। তার হাড্ডিসার হাতের ফাঁক গলে পড়ে গেল রিসিভার, ঝুলতে লাগল। ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল জন। বেরিয়ে এল।

ওকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। সময় মত ফিরতে হবে নিজের কবরে।

সাবরিনা

প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বেলমন্টকে। শহরের ঘিঞ্জি, নোংরা এলাকায় ভবনটি। ওখানে এখন লাইভ শো চলছে। গায়ক, নর্তকী এবং কৌতুকাভিনেতারা নানা কসরৎ দেখাচ্ছে। কেউ ক্যাবারে নাচে, কেউ বা জাদু দেখায়। আমি আমার দুই প্রিয় বন্ধু উইনস্টন এবং জোয়ি-কে নিয়ে শো দেখতে এসেছি। আমরা সবাই সমবয়েসী—চোদ্দ। আজ শনিবার, বিরক্তিকর একটা বিকেল রাস্তায় কাঁহাতক হেঁটে বেড়ানো যায়। শেষে ঠিক করলাম বেলমন্টে যাব। ম্যাটিনি শো'র টিকেট দুই ডলার মাত্র। একটু মজা পেতে দু'ডলার খরচে আমাদের কারও আপত্তি নেই।

আমরা বেলমন্টে এসেছি প্রাণ খুলে হাসতে। টিকেট কাউন্টারের লোকটাকে দেখেই হাসি পেয়ে গেল। লাল টকটকে চোখ, নাকটাও লাল পচা গাজরের মত। ক্লাউন টাইপের চেহারা।

তবে লোকটার যে জিনিসটি দেখে আমাদের সবচে' হাসি পেল তা হলো নকল দাঁত। কথা বলার সময় মুখ থেকে খুলে আসছিল ওগুলো। লোকটা জিভ দিয়ে আবার দাঁতগুলো চালান করে দিল মুখের ভেতরে। ক্লাউনটা টিকেটের দাম রেখে ভাঙতি পয়সা আর টিকেট এগিয়ে দিল কাউন্টারের ফোকর দিয়ে।

'উদ্ভট সৃষ্টিটাকে দেখলে?' জিজ্ঞেস করল উইনস্টন। হাসির চোটে নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে এল।

আমি উইনস্টনের চেয়েও জোরে হাসছি, জবাবই দিতে পারলাম না।

আর জোয়ি এমন উন্মাদের মত হাসছে যেন হাসির দমকে পড়েই যাবে। ওকে একরকম কাঁধে তুলে ক্লাউন টিকেট চেকারের পাশ দিয়ে নিয়ে এলাম। লোকটা সাদা একটা টুক্সেডো পরেছে। মানায়নি একদম।

'এত হাসাহাসি ভাল নয়,' আমাদের টিকেট ছিঁড়তে ছিঁড়তে মন্তব্য করল গেটে দাঁড়ানো লম্বা লোকটা। দরদর করে ঘামছে।

'জী।' মাথা দোলাল উইনস্টন, নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় শব্দ বেরোল। হাসি চেপে রাখার বৃথা চেষ্টা।

তারপর তিনজনে মিলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। নাকে ধাক্কা মারল পুরনো কার্পেট, এবং বাসী পপকর্ন-এর মিশ্রিত বিদঘুটে একটা গন্ধ। চারপাশে চোখ বুলালাম। লোকজন নেই বললেই চলে। যে কোনও জায়গায় বসা চলে।

মঞ্চের কাছে জুৎ হয়ে বসলাম আমরা। শো শুরু হবার অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবার কথা। তবে কখন শুরু হয় কে জানে। বিরক্ত হয়ে জোয়ি গেল পপকর্ন কিনতে। ও ফিরে এসেছে, প্রেক্ষাগৃহের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে এল। একটা স্পটলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্টেজ। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক।

'গুড আফটারনুন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন,' শিস দেয়ার মত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসছে তার। 'বেলমন্ট ভ্যারাইটি শোতে স্বাগতম! আজ আপনাদের বিনোদনের জন্য রয়েছে–'

কিন্তু লোকটার কথা আমি শুনছি না। দেখছি তাকে। এ সেই নকল দাঁতঅলা টিকেট বিক্রেতা।

'অ্যাই,' বন্ধুদেরকে ফিসফিস করে বললাম আমি। 'এ লোকটার দেখছি প্রতিভার শেষ নেই। সে টিকেট বিক্রি করছে, আবার শো'র অ্যানাউন্সও করছে!'

'হুঁ।' মাথা ঝাঁকাল উইনস্টন। 'সম্ভবত সবগুলো খেলাও সে একাই দেখাবে।'

হেসে উঠলাম তিনজনে একযোগে। হি হি হা হা চলতেই লাগল লাল পর্দা স্টেজের ওপরের দিকে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত। কাউবয়ের পোশাক পরা এক লোক চলে এল স্টেজে। সে কৌতুক শোনাতে লাগল। প্রথমে হাসি পেলেও পরে আর হাসি পেল না।

'ভেগে পড়ো, কাউবয়!' সামনের সারি থেকে হাঁক ছাড়ল এক দর্শক। 'দুধ দুইতে যাও!'

লোকটার জোকস শুনে দর্শক যতটা না হেসেছে তারচেয়ে দ্বিগুণ হাসিতে ফেটে পড়ল এ কথায়।

'সাবরিনাকে নিয়ে এসো!' পেছনের সারি থেকে চেঁচাল আরেক দর্শক।

কাউবয়-কমেডিয়ান ওই দুই দর্শককে নিয়ে মশকরা করে কিছু কথা বলল। ওরা দু'জন ছাড়া বাকি দর্শক ফেটে পড়ল হাসিতে। দুই দর্শককে নাস্তানাবুদ করা গেছে, চেহারায় এমন সন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়ে স্টেজ ছাড়ল কাউবয়। সবাই হাততালি দিল তাকে অভিনন্দন জানাতে নয়, সে চলে গেছে বলে।

আমি জোয়ি'র আনা হাজার বছরের পুরানো পপকর্ন চিবুচ্ছি বিরস বদনে, এমন সময় আরেক লোকের আবির্ভাব ঘটল মঞ্চে।

'ওহ্, না,' গুঙিয়ে উঠলাম আমি। 'এ দেখছি সেই গেটম্যান। অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে এসেছে!'

যে লোকটা গেটে টিকেট ছিঁড়ে আমাদের ভেতরে ঢুকতে

দিয়েছে সে এবার ট্যাপ-ডান্সারের ভূমিকা নিল। অ্যাকর্ডিয়ানের তালে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল লোকটা। মুখে কৃত্রিম হাসি। গেটে দাঁড়িয়ে লোকটা যেমন ঘামছিল, এখন তারচেয়ে বেশি ঘামছে। তার নাচ দেখে হে হে করে হাসতে লাগল দর্শক। তাকে উদ্দেশ্য করে সরস মন্তব্য করছে। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে লম্বু।

লোকটার জন্য আমার মায়াই লাগল। তবে প্রেক্ষাগৃহের সবাই ঠাট্টা করছে ওকে নিয়ে। লোকটা যেন শাওয়ার থেকে বেরিয়েছে। নাচের তালে ঘামের ফোঁটা ছিটকে পড়ছে দর্শকের গায়ে। যেন বাগানের পিচকারি দিয়ে পানি ছিটানো হচ্ছে।

'কারও কাছে ছাতা আছে, ভাই?' গলা ফাটাল জোয়ি।

'আমরা সাবরিনাকে চাই!' দুই দর্শক হাঁক ছাড়ল। তারপর সুর করে বলতে লাগল, 'সাবরিনাকে চাই! সাবরিনাকে চাই!' ঘর্মাক্ত ট্যাপ- ডান্সার স্টেজ ত্যাগ না করা পর্যন্ত থামল না।

আমি দর্শকদের ওপর একবার নজর বুলালাম। অল্প ক'জন দর্শকের সবাই 'সাবরিনা! সাবরিনা!' বলে চেঁচাতে শুরু করেছে। কে এই সাবরিনা? ভাবলাম আমি। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কেউ।

স্টেজে কারও দেখা নেই। শূন্য। অধৈর্য দর্শক এবারে মেঝেতে পা ঠুকতে লাগল। তাদের চেঁচামেচিতে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়, এমন সময় ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে সেই অ্যাকর্ডিয়ান প্লেয়ার হাজির হলো মঞ্চে। মেঝেতে পা ঠোকা বন্ধ হলো। বোকা বোকা হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'এবার আসছে সে, যার জন্য এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে আছেন আপনারা।' মাথা নোয়াল সে, মুখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে এখনও। 'আপনাদেরকে আনন্দ দিতে আসছে মিষ্টি সাবরিনা এবং জঘন্য রোবট রোন্ডা।'

নিভু নিভু হয়ে এল মঞ্চের আলো। একটা পরিবর্তন লক্ষ

করলাম দর্শকদের মধ্যে। সবাই নড়েচড়ে বসেছে। কারও মুখে কথা নেই। পর্দা নেমে এল স্টেজে। ব্যাক স্টেজ থেকে শোনা গেল পায়ের শব্দ। তারপর ওপরের দিকে উঠে গেল পর্দা, দেখলাম স্টেজে এক তরুণী বসে আছে। কোলে ভেন্ট্রিলোকুইস্ট-এর ডামি।

তরুণী, মানে সাবরিনাকে দেখে দম বন্ধ হয়ে এল আমার। তার চুলের রঙ সোনালি-পিঙ্গল। ফর্সা ত্বকে একটা দাগও নেই, নরম বাদামী একজোড়া চোখ। আমি জীবনেও এত সুন্দর মেয়ে দেখিনি। বয়স বড় জোর আঠারো হবে, একটু বেশিও হতে পারে। আমি মেয়েটির ওপর থেকে চোখ সরাতে পারলাম না।

সাবরিনার কোলে শুয়ে আছে রোবট রোন্ডা। সে একখানা জিনিস বটে। এমন ভয়ঙ্কর চেহারা! লম্বায় বড় জোর দু'ফুট হবে, মোটা, বেঢপ শরীর। শরীরের তুলনায় চৌকোনা মাথাটা প্রকাণ্ড। স্টেজ থেকে বেশ খানিকটা পেছনে বসা থাকলেও পরিষ্কার দেখতে পেলাম রোন্ডার টাক মাথায় ক'গাছি চুল আঠার মত লেপ্টে আছে। তার সাঁরা মুখ এবং হাতে বড় বড় কুৎসিত আঁচিল।

'হ্যালো, বন্ধুরা,' ভারী মিষ্টি গলায় বলে উঠল সাবরিনা।

'রোন্ডা এবং আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

'আহ্, চুপ করো!' খরখরে গলায় দাবড়ানি দিল রোন্ডা।

'দর্শক তোমাকে দেখতে আসেনি। এসেছে আমাকে দেখতে।'

'রোন্ডা, ডিয়ার,' নরম গলা সাবরিনার। 'অমনভাবে বলে না। উপস্থিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহোদয়াগণের সঙ্গে যখন কথা বলব দয়া করে চুপ করে থেকো।'

'আমার একটা কৌতুক মনে পড়েছে!' সাবরিনাকে অগ্রাহ্য করল রোভা। 'খুব ভাল জোকস। কাজেই তুমি চুপ করে থাকো।'

রোভা জোকস বলছে, আমি সামনের দিকে ঝুঁকে এলাম। তবে ওর কথা কানে যাচ্ছে না আমার, সমস্ত মনোযোগ সাবরিনার দিকে। সাবরিনার সুন্দর মুখখানা বন্ধ, তবে লক্ষ করছি রোভার সঙ্গে কথা বলার সময় ওর ঠোঁট নড়ছে। তার ডান হাত রোভার পিঠে। আমি বুঝতে পারছি ওই হাত দিয়ে সে রোভাকে কন্ট্রোল করছে। কোনও যন্ত্রপাতির বোতাম হয়তো টিপছে, সেই সঙ্গে রোভার মুখ খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে। মাথাটা ঝাঁকি খাওয়ার ভঙ্গিতে ঘুরছে, নাড়াচ্ছে মোটা হাত-পা।

দর্শক রোভা ও সাবরিনার নাটক যে খুব উপভোগ করছে তা তাদের হাততালি দেখে বোঝা গেল। রোভাও তার মোটা মোটা হাত দিয়ে তালি বাজাচ্ছে। তারপর সাবরিনার লম্বা গ্রীবা জড়িয়ে ধরল।

'ধন্যবাদ, রোভা,' মধুমাখা গলায় বলল সাবরিনা। 'তোমার গল্প বলা শেষ হলে এবারে আমি দর্শকদের একটি গান শোনাতে চাই।'

কাঠের কুৎসিত ডামিটা ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল। সাবরিনা গান ধরেছে, কটমট করে তাকিয়ে থাকল সে মেয়েটির দিকে। কোনও যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে না। স্রেফ সাবরিনার স্ফটিক-স্বচ্ছ অপূর্ব কণ্ঠের ঝংকারে ভরে গেল প্রেক্ষাগৃহ। চমৎকার একটি গান গাইল সে। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম তার গান।

শো শেষ হয়েছে সেই কখন, এখনও আমার কানে বাজছে সাবরিনার মধু মাখা কণ্ঠ। চোখের সামনে ভাসছে ওর গান গাইবার দৃশ্য। বিছানায় শুয়ে আছি আমি, দৃষ্টি ছাদে। বাবা ডাক

দিলেন নীচ থেকে, জানতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে ছবি দেখব কি না। ছবি ভাড়া করে এনেছেন বাবা। প্রায়ই আনেন।

'আমার খুব ক্লান্ত লাগছে,' বললাম আমি। 'দেখব না।' আমি এখন শুধু সাবরিনার কথা ভাবব।

'ও তো সিনেমা না দেখে থাকার ছেলে নয়,' শুনলাম মা বলছেন বাবাকে। 'দেখতে যখন চাইছে না, থাক। শরীর বোধহয় ভাল ঠেকছে না।'

'কী জানি!' বললেন বাবা। 'বলল তো ক্লান্ত।'

আমি কল্পনায় সাবরিনাকে দেখতে পাচ্ছি। সে রোভাকে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে সিধে হয়েছে। দর্শকদেরকে উদ্দেশ্য করে বো করল। ঝপ করে নেমে এল পর্দা। একটু পরে আবার খুলল। নতুন করে শুরু হয়ে গেল সাবরিনার শো।

'তুই সত্যি ছবি দেখবি না?' বাবার ডাকে কল্পনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। এমন রাগ লাগল!

'না!' ঘর ফাটিয়ে চেঁচালাম আমি।

'আহ্, দেখতে যখন চাইছে না ওকে খামোকা ডাকছ কেন?' মা'র গলা।

বাবা জবাবে কিছু একটা বললেন। কিন্তু শুনতে পেলাম না। আমি বাবা-মা'র গলা আর শুনতে চাই না। আমার মন এখন ভেসে চলেছে অন্য কোথাও। সাবরিনার কাছে। সাবরিনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছি না আমি।

পরদিন উইনস্টন ফোন করল আমাকে। সান্ডারসন্ পার্কে যেতে বলল। বেসবল খেলা হবে। প্রতি রোববার খেলি আমরা। বললাম অসুস্থ। যেতে পারব না।

'ঠিক আছে। সুস্থ হয়ে ওঠো,' বলল উইনস্টন। 'পরে খেলা

যাবে।'

আমি বেসবল খেলতে যাব না, কারণ শহরে যাব। বেলমন্টে। রোববারের ম্যাটিনি শো দেখতে। সাবরিনাকে দেখব।

বুঝতে পারছি সাবরিনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি আমি। এখন প্রতি উইক এন্ডে শনি ও রোববার ম্যাটিনি শো আমার দেখা চাই-ই। এমনকী শুক্রবার রাতের শোতেও যাই। কখনও যাই বন্ধুদের সঙ্গে, তবে বেশিরভাগ সময় একা। সাবরিনার কোনও ভাগীদার আমি চাই না।

সাবরিনার সমস্ত আচার-আচরণ এখন মুখস্থ আমার। ওর গানগুলো ঠোঁটস্থ। রোন্ডার জোকস, সে কী বলবে, কখন হাত-পা নাড়বে সব বলে দিতে পারি এখন।

সাবরিনার শো'র ব্যাপারে আমাকে আপনারা এখন এক্সপার্ট বলতে পারেন। ওর ছোটখাটো কোনও বিষয়ও আমার চোখ এড়ায় না। সাবরিনা সবসময় সুন্দর সুন্দর পুরনো ফ্যাশনের পোশাক পরে আসে। এগুলোর গলা উঁচু, লেসের কাজ করা। সে সবসময় পা মুড়ে বসে। তার প্রতিটি আচরণে মার্জিত নারীর ভব্যতা ফুটে ওঠে। আর সবসময় মিষ্টি করে হাসে সাবরিনা। সব সময় তার বাঁ হাত থাকে কোলের ওপর, ডান হাত ডামির পিঠে।

রোন্ডা ঠিক তার বিপরীত। কর্কশ, বদ মেজাজী। তার চেহারায় সবসময় বিরক্তির ভাব। সাবরিনার দিকে তাকিয়ে থাকে কটমট করে এবং হাতের নকল আঁচিল বা জড়ুল নিয়ে খেলা করে।

ওরা দু'জনে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বলেই খেলাটা জমে ওঠে। একজন অপূর্ব সুন্দরী, অপরজন বেজায় কুৎসিত। আমি শো দেখার সময় মাঝে মাঝে ভাবি সাবরিনা এরচেয়ে সুন্দর

একটা ডামি জোগাড় করতে পারলে খুব ভাল হত। ওরকম ভয়ঙ্কর, সৃষ্টিছাড়া ডামির সঙ্গে সাবরিনাকে মেনে নিতে খুব কষ্ট হয় আমার। তা ছাড়া বেলমন্ট থিয়েটারের মত বিশ্রী একটা জায়গায় সাবরিনার মত মেয়ের পড়ে থাকা মোটেই মানায় না। এরচেয়ে ভাল জায়গায় কাজ করার যোগ্যতা ওর আছে।

বন্ধুরা বলে আমি নাকি সাবরিনার জন্য পাগল হয়ে গেছি। ওদের আগের মত সঙ্গ দিই না বলে অভিযোগ করে।

'তুমি একটা ভেনট্রিলোকুইস্টের প্রেমে পড়লে কীভাবে?' জোয়ি সবসময় ঠাট্টা করে আমাকে। 'মেয়েটা সুন্দর হতে পারে, কিন্তু কাজ তো করে একটা ভূতুড়ে জায়গায়।'

'তা ছাড়া মেয়েটা তোমার চেয়ে বয়সেও বড়,' বলে উইনস্টন। 'আর খুব বেশি সুন্দরী। সে তোমার মত খোকা বাবুর সঙ্গে প্রেম করতে যাবে কোন্ দুঃখে?'

এসব প্রশ্নের জবাব দেই না আমি। জানি আমার বয়স খুব কম এবং সাবরিনা কোনওদিনই আমার গার্লফ্রেন্ড হতে চাইবে না। কিন্তু তবু সাবরিনার কথা না ভেবে থাকতে পারি না। আমার বার বার মনে হয় সাবরিনার মত মিষ্টি মনের মেয়ে কাউকে আঘাত দিতে পারে না। আমাকেও না। আমি যে প্রতিদিন শো দেখতে যাই, সাবরিনা সেটা লক্ষ করেছে। আমার সঙ্গে তার মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয়। তবে সাবরিনাকে খুব কাছে থেকে দেখতে চাই আমি। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ওর মুখোমুখি হতে চাই। এবং জানি কাজটা আমি শিগগিরি করব।

আজ শুক্রবার। আজ সাবরিনার সঙ্গে দেখা করব আমি। সারাদিনই ক্লাসে সাবরিনার কথা মনে পড়েছে আমার। ছুটির ঘণ্টা বাজতেই রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশে। বাবা-মা'কে কীভাবে

ভজিয়ে শো দেখতে যাব সে পরিকল্পনাই সাজাচ্ছি মনে মনে। বলব উইনস্টনের বাসায় আজ আমি আর জোয়ি থাকব। বাবা-মা উইনস্টনের বাসায় রাত্রিযাপনে নিষেধ করেন না। ও আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ওকে নিয়ে মাঝে মাঝে ক্লাস-নোট করি। তখন রাতটা থেকে যাই ওর বাড়িতে।

উইনস্টনকে অবশ্য আগেই বলে রেখেছি রাতে বাবা-মা ফোন করলে যেন পরিস্থিতি সামাল দেয়। উইনস্টনের সঙ্গে পরীক্ষার নোট করব শুনে বাবা-মা ওদের বাসায় যেতে মানা করলেন না। আমিও দেরি করলাম না। ছুটলাম শহরে। সাবরিনাকে দেখতে।

শো দেখার সময় নার্ভাস হয়ে থাকলাম আমি। সিঁটিয়ে আছি ভয়ে, কারণ বাবা-মা যদি বুঝে যান তাঁদেরকে মিথ্যা কথা বলেছি আমি! ভয় লাগছে উইনস্টন যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে ধরা খাইয়ে দেয় আমাকে। তবে শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে ঠিক এসব কারণে নয়। শো শেষে যে পরিকল্পনা করেছি সেভাবে কাজ হবে কি না ভেবে শঙ্কা কাজ করছে আমার মধ্যে। আমি ব্যাক স্টেজে গিয়ে সাবরিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। হয়তো তার অটোগ্রাফ নিতে পারব, কথা বলার সুযোগও হয়ে যেতে পারে।

শেষ হয়ে গেল শো। জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগৃহের আলো। নকল দাঁতঅলা ঘোষক রুটিন মাফিক বলল, 'আসার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।' লোকজন বেরিয়ে যেতে লাগল প্রেক্ষাগৃহ থেকে। আমি গেলাম না। দাঁড়িয়ে থাকলাম ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম স্টেজে, বিশাল লাল পর্দার ভাঁজে লুকিয়ে থাকলাম।

একটু পর পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। ব্যাক স্টেজ থেকে একটা করিডরে নেমে এলাম। নগ্ন আলো জ্বলছে ভূতুড়ে করিডরে। মোড় ঘুরতেই ড্রেসিং রুমের দরজা চোখে

পড়ল। সারি সারি দরজা। আমি একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। এ দরজার গায়ে একটি কাগজ সাঁটা। কাগজে বড় বড় অক্ষরে কালো কালিতে লেখা সাবরিনা।

'এখানে কী করছ তুমি?' পেছন থেকে ঘেউ করে উঠল একজন।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম। সেই দরদরে ঘামে ভেজা গেটম্যান। পরনে আন্ডার সার্ট এবং টুক্সেডো প্যান্ট। দুটোই ঘামে ভিজে সেঁটে রয়েছে গায়ে।

'সাবরিনার অটোগ্রাফ নিতে এসেছি,' বললাম আমি, ভয়ে আছি কখন কানে মোচড় খাই।

কিন্তু লোকটা কান ধরে মোচড় দিল না, হলুদ দাঁত বের করে হাসল। দরজায় একটা ঘুসি দিল।

'অ্যাই, তোমার একজন ভক্ত এসেছে!'

'কে?' ভেতর থেকে সাবরিনার মিষ্টি কণ্ঠ ভেসে এল।

'একটা বাচ্চা,' দীর্ঘ বিরতি।

'ছোঁড়াকে ভেতরে নিয়ে এসো!' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল রোন্ডা।

'হ্যাঁ, ভেতরে এসো,' বলল সাবরিনা নরম গলায়।

'যাও, খোকা,' বলল ঘর্মাক্ত লোকটা। ধাক্কা মেরে খুলল দরজা। বুড়ো আঙুল দিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করল ভেতরে যেতে।

'তুমি ওর প্রেমে পড়ে গেছ, না?' চোখ টিপল সে। 'অবশ্য এ জন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী।'

ড্রেসিংরুমটা বেশ বড়সড়, অন্ধকার। বেলমন্ট থিয়েটার-এর নাম লেখা সবুজ নিয়ন জ্বলছে জানালার বাইরে। সে আলোর খানিকটা প্রতিফলনে ঘরের অন্ধকার সামান্যই দূর হয়েছে। ঘরের কিনারে, জানালার নীচে ছেঁড়া একটা সোফায় বসেছে সাবরিনা।

হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার ডান হাত যথারীতি রোন্ডার পিঠের নীচে। রোন্ডা তার পাশে বসা, বিরক্তিতে কোঁচকানো মুখ, হাতের জড়ুল নিয়ে খেলায় ব্যস্ত।

'হাই!' বললাম আমি। আমার কণ্ঠ ভাঙা এবং অদ্ভুত শোনাল। আমি এক পা দিয়ে আরেক পা কচলাতে কচলাতে যোগ করলাম, 'আ-আমার একটু নার্ভাস লাগছে।' কেন এ কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল নিজেও জানি না।

'তোমার নাম কী?' এমন নরম গলায় প্রশ্ন করল সাবরিনা!

আমি আমার নাম বললাম। তারপর বোকার মত নিজের বয়সটাও বলে ফেললাম।

হেসে উঠল রোন্ডা। 'তা হলে তোমার চোখে সাবরিনা খুব সুন্দরী, না? ওকে পছন্দ করো?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলাম আমি। তারপর লজ্জিত চেহারা নিয়ে ফিরলাম সাবরিনার দিকে। 'আমি আপনার সবগুলো শো দেখেছি। আমার কথা শুনে হয়তো আপনার মনে হতে পারে আমি একটা বোকা। তবে আপনাকে আমার দারুণ লাগে। আপনি দেখতে এত সুন্দর–'

'হুঁ,' ঘোঁতঘোঁত করল রোন্ডা। 'তুমি সত্যি একটা বোকা ছেলে।'

আমার মুখ লাল হয়ে গেল।

সাবরিনা হাসল। 'বেশ,' বলল সে। 'আমার মনে হয় তুমি ছেলে মন্দ নও।' চোখ পিটপিট করল সে। 'তুমি আমার শো দেখো এবং আমাকে দেখতে এখানে পর্যন্ত চলে এসেছ, আমি খুশি হয়েছি।'

আমার চেহারায় আরও রঙ ধরল।

রোন্ডা সাবরিনার পাশ থেকে ফোড়ন কাটল। 'ছেলেটাকে যদি

তোমার এতই পছন্দ হয়ে থাকে তা-হলে ওকে একটা চুমু উপহার দিচ্ছ না কেন?'

হাতের ঝাপটায় বাতি জ্বেলে দিল সাবরিনা। আমাকে অবাক করে দিয়ে সোফা ছাড়ল, হেঁটে আসতে লাগল আমার দিকে। আমি আতঙ্ক বোধ করলাম। আমাকে কি ও সত্যি চুমু খাবে?

'প্রেমকাতর ছোঁড়াকে দ্যাখো!' খনখন করে উঠল রোল্ডা।

সাবরিনা হেঁটে আসছে আমার দিকে, আমি সরে যেতে লাগলাম, কুৎসিত ডামিটার দিকে এগোচ্ছি, ওটা এখনও বসে আছে জীর্ণ সোফায়।

'কী হলো, লাভার বয়?' ঠাট্টা করল রোল্ডা। চৌকোনা মাথাটা একপাশে কাত করল সে, খুদে পা জোড়া দিয়ে লাথি কষাল সোফার পাশে।

সাবরিনার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম আমি, তাকালাম রোল্ডার দিকে। প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারলাম না। কিন্তু তারপর ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল আমার। যা দেখছি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। রোল্ডা তার পা নাড়ে কীভাবে? সে কথাই বা বলে কীভাবে? তার ঠোঁট নড়ছে কীভাবে? সাবরিনা তার পাশে নেই, তাকে পরিচালনাও করছে না, তা হলে রোল্ডা এসব করছে কী করে?

সাবরিনা ঘুরল আমার দিকে। মুখে হাসি ধরে এগিয়ে আসতে লাগল।

'স্বপ্ন কন্যাকে কেমন লাগছে তোমার?' ঘোঁত ঘোঁত করল রোল্ডা।

আমি রোল্ডার হাতের দিকে তাকিয়ে আছি। যেগুলোকে এতদিন আঁচিল বা জড়ুল ভেবে এসেছি ওগুলো আদৌ তা নয়। কালো কালো জিনিসগুলো আসলে বোতাম!

একটা বোতাম টিপল রোভা... থেমে গেল সাবরিনা।

'বুঝতে পারলে তো রোবট কীভাবে কাজ করে?' খ্যাকখ্যাক করে উঠল রোভা। মাথায় ঢুকল কিছু?' আঁচিল সদৃশ আরেকটা বোতাম টিপল সে।

'হ্যালো, বন্ধুরা,' বলল সাবরিনা। 'আমার এবং রোভার পক্ষ থেকে আমাদের শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

আমি হেঁটে গেলাম সাবরিনার কাছে। ওর নিখুঁত, সুন্দর মুখ স্পর্শ করলাম হাত দিয়ে। সিনথেটিক মনে হলো... বরফের মত ঠাণ্ডা।

শুনলাম হা হা করে হেসে উঠল কেউ।

রোভা আরেকটি কন্ট্রোল বাটনে চাপ দিল। সাবরিনার শরীরের ভেতরে টেপ ঘোরার শব্দ শুনতে পেলাম।

'না!' ককিয়ে উঠলাম আমি।

'হ্যালো, বন্ধুরা,' বলল সাবরিনা। 'আমার এবং রোভার পক্ষ থেকে আমাদের শোতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে ছুটলাম দরজার দিকে। করিডর ধরে ছুটলাম, কানে বিস্ফোরণের মত বাজছে হাসির শব্দ। কাউবয়-কমেডিয়ান, নকল দাঁতঅলা টিকেট বিক্রেতা, ঘামে জবজবে হয়ে থাকা গেটম্যান, ওরা দেখছে আমাকে ছুটে পালাতে... হাসছে ওরা হা হা করে, যেন এমন হাসি জীবনে হাসেনি।

পাখি

ডিসেম্বরের তিন তারিখে হুট করে বদলে গেল আবহাওয়া, নেমে এল শীত। এর আগ পর্যন্ত বইছিল শরতের মৃদু-মন্দ বাতাস। গাছে সোনালি-লাল পাতা, বেড়া-ঝোপের রঙও ছিল সবুজ। কর্ষণ করা জমি ছিল উর্বর।

যুদ্ধে অশক্ত হয়ে যাওয়া ন্যাট হোকেন খামারে পুরো সময় ব্যয় করত না পেনশন পায় বলে। হপ্তায় তিন দিন গতর খাটায় সে, ওরা ওকে হালকা কাজ দেয়; বেড়া দেওয়া, খড় কিংবা তালপাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি বানানো, খামার-বাড়ির ছোটখাট মেরামত ইত্যাদি।

বিবাহিত ন্যাট সন্তানের জনক, তবু একাকী সে; ভালবাসে একা কাজ করতে। কেউ ওকে নদীর তীরে ঢিবি তৈরি করতে দিলে খুশি হয় কিংবা খাঁড়ির শেষ মাথায় গেট বানানোর কাজ পেলে সে আনন্দিত হয়ে ওঠে। বাড়ির ধারে সাগর ফার্ম ল্যান্ডটাকে দু'দিক থেকে ঘিরে আছে। দুপুর বেলা কাজে বিরতি দেয় ন্যাট। বউ'র দেওয়া মাংসের বড়া খায় এবং পাহাড় চুড়োয় বসে পাখি দেখে। পাখি-দর্শনের জন্যে বসন্তের চেয়েও ভাল হলো শরৎকাল। বসন্তে পাখিরা সমুদ্র থেকে দূরে চলে যায়। তবে যারা মাইগ্রেট করেনি বা অন্য দেশে উড়াল দেয়নি, শীতকালটা এখানেই কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, তারাও চলে যাওয়ার

দুরন্ত ইচ্ছায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের জীবন-চক্রটা এমনই, অভিবাসী হওয়ার সুযোগ ঘটে না। দল বেঁধে আসে তারা খাঁড়ি বা উপদ্বীপে, অস্থির আর চঞ্চল, সারাক্ষণই রয়েছে ব্যস্ততার মাঝে; এই চক্রাকারে ঘুরছে, বৃত্ত নিয়ে চক্কর দিচ্ছে আকাশে, আবার মাটিতে নেমে আসছে খাবার খেতে। তবে খায়ও অনিচ্ছায়, যেন খিদে পায়নি। অস্থিরতা ওদেরকে আবার উড়িয়ে নিয়ে যায় শূন্যে।

সাদা-কালো, দাঁড়কাক এবং শঙ্খচিল, অদ্ভুত একটা অংশীদারিত্ব গড়ে নিয়ে একত্রে মিলে মিশে থাকে, এক ধরনের স্বাধীনতা খুঁজে বেড়ায়, সবসময় অসন্তুষ্ট এবং সর্বদা অশান্ত। স্টারলিং-এর দল, মখমলের মত খসখস শব্দ করে, উড়ে যায় তাজা তৃণভূমিতে, এ যেন স্রেফ অস্থিরতার কারণেই ওড়া, আর ছোট পাখিগুলো, ফিন্‌চ্‌ ও ভরতের দল গাছ থেকে লাফিয়ে ঝোপের উপর গিয়ে পড়ে, যেন বাধ্য করা হয়েছে তাদেরকে।

ন্যাট লক্ষ করে ওদেরকে, সী-হার্ড বা সামুদ্রিক পাখিগুলোকেও দেখে। উপসাগরের ধারে স্রোতের জন্য অপেক্ষা করে তারা। এদের ধৈর্য অন্যদের চেয়ে বেশি। অয়েস্টার-ক্যাচার, রেড শ্যাঙ্ক স্যান্ডারলিং ও কারলিউরা অপেক্ষা করে জলের কিনারে; সাগরের জল ডুবিয়ে দেয় তীর, তারপর নেমে যায়, পড়ে থাকে সামুদ্রিক আগাছা আর অমসৃণ নুড়ি, দৌড়ে যায় সামুদ্রিক পাখিরা, ছোটাছুটি করতে থাকে তীরে। তাদেরও তখন ওড়ার ইচ্ছে জাগে। চিৎকার-চেঁচামেচি করে তারা, শিস দেয়, ডাকে, আলতোভাবে ছুঁয়ে যায় ঝলমলে সাগর, তারপর দ্রুত ত্যাগ করে তীর। স্বল্পকালের শরৎ নিয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়, শীতের আগমন ওদেরকে আতঙ্কিত করে তোলে।

পাহাড় চুড়োয় বসে মাংসের বড়া চিবোতে চিবোতে ভাবে

ন্যাট সম্ভবত শরৎ পাখিদের কাছে একটা সতর্কবার্তার মত। সাবধান করে দেয় শীত আসছে। শীতে মারা যায় অনেকেই।

এবারে পাখিগুলো, বছরের এ সময়টাতে যেন অন্যান্যবারের চেয়ে বেশি অস্থির। দিনগুলো স্থির বলে ওদের উত্তেজনাটা প্রকটভাবে ধরা দেয় চোখে। পশ্চিমের পাহাড়ে ট্রাক্টর চালায় যে চাষা সেও ন্যাটের মন্তব্যকে সমর্থন করে বলেছিল, 'হ্যাঁ, এবারে একটু বেশিই চোখে পড়ছে পাখিদের আনাগোনা। আর সাহসও যেন বেশি। আমার ট্রাক্টরকে কেউ কেউ পাত্তাই দিতে চায় না। আজ বিকেলে দুটো সীগাল মাথার উপরে এমনভাবে উড়ছিল, যেন ঠুকরে ফেলে দেবে মাথার ক্যাপ। আমার মনে হচ্ছে বদলে যাবে আবহাওয়া। এবারে কঠিন শীত পড়বে। এ কারণে অস্থির পাখিরা।'

সন্ধ্যা নামছে। বাড়ির পথ ধরল ন্যাট। মাঠ পেরিয়ে চলেছে নিজের কুটিরে। পশ্চিমের পাহাড়ে, সূর্যাস্তের শেষ আলোয় কতগুলো পাখিকে উড়তে দেখল সে। বাতাস নেই, ধূসর সাগর শান্ত এবং পূর্ণ। কৃষক লোকটা ঠিকই বলেছিল হুট করে বদলে যাবে আবহাওয়া।

ন্যাটের শোয়ার ঘর পুব দিকে মুখ করা। রাত দুটোর দিকে বাতাসের শব্দে জেগে গেল সে। চিমনি থেকে শোঁ শোঁ আওয়াজ আসছে। পুবালি বাতাস। ঠাণ্ডা ও শুকনো। ছাদের একটা সেলেট পাথর সম্ভবত আলগা হয়ে গেছে। ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। কান পাতল ন্যাট। উপকূলে গর্জাচ্ছে সাগর। ছোট কামরাটি হঠাৎ শীতল হয়ে উঠেছে; দরজার ফাঁক দিয়ে বয়ে আসা দমকা বাতাস আছড়ে পড়ল বিছানায়। গায়ে কম্বল টেনে দিল ন্যাট, ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে একটু সরে এল, চোখ এবং কান সতর্ক।

জানালায় হঠাৎ ঠক ঠক শব্দ। কটেজের দেয়াল ঘেঁষে কোনও

গাছ নেই যে ডালের বাড়ি খেয়ে এমন শব্দ তুলবে। শব্দটা হতেই লাগল। শেষে বিরক্ত ন্যাট নেমে পড়ল বিছানা থেকে, গেল জানালার ধারে। খুলল। সাথে সাথে হাতে কিছু একটা ঘষা খেল, আঙুলের গাঁটে ঠোকর দিল, আঁচড় কাটল চামড়ায়। পতপত শব্দে একজোড়া ডানা ঝাপটাল, উড়ে গেল ছাদের উপরে, সেখান থেকে বাড়ির পিছনে।

একটা পাখি। কী পাখি বলতে পারবে না ন্যাট। ভাল করে দেখতে পায়নি। বাতাসের তাণ্ডবে নিশ্চয় আশ্রয়চ্যুত হয়েছে।

জানালা বন্ধ করে দিল সে। ফিরে এল বিছানায়। আঙুলের গাঁট চুষছে। ঠোকর মেরে রক্ত বের করে দিয়েছে পাখিটা। ঘুমাবার চেষ্টা করল ন্যাট।

আবার ঠক ঠক শব্দ। এবার আরও জোরে। যেন জিদ ধরে ঠোকর দিচ্ছে। শব্দে জেগে গেল ন্যাটের বউ। স্বামীর দিকে পাশ ফিরে বলল, 'জানালাটা একটু দেখো তো, ন্যাট। ঠকর ঠকর শব্দ হচ্ছে কে

'দেখেছি,' জানাল ন্যাট। 'একটা পাখি। ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? পুব থেকে বইছে। পাখিদের আস্তানার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

'পাখিটিকে হঠাও,' বলল বউ। 'এমন শব্দ হলে ঘুমাব কী করে?'

দ্বিতীয়বার জানালার সামনে গেল ন্যাট। খুলে দেখল একটি নয়, কমপক্ষে আধডজন পাখি বসে আছে জানালার চৌকাঠে; ওগুলো সোজা উড়ে এল ন্যাটের মুখ লক্ষ্য করে, হামলা চালিয়ে বসল।

চিৎকার দিল ন্যাট, হাত দিয়ে বাড়ি মেরে সরিয়ে দিল সব ক'টাকে; প্রথমটার মত এরাও উড়ে গেল ছাদে, তারপর চোখের

আড়ালে। ঝট্ করে জানালা বন্ধ করল ন্যাট, লাগিয়ে দিল ছিটকিনি।

'শব্দ শুনেছ?' বলল সে। 'ওরা আমাকে হামলা করেছিল। অন্ধ করে দিতে চেয়েছে।' জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে উঁকি দিচ্ছে ন্যাট। কিছুই চোখে পড়ছে না। ঘুমে প্রায় আচ্ছন্ন ন্যাটের বউ বিড়বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না।

'আমি এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে পারব না,' বউ'র নিস্পৃহ আচরণে রেগে গেছে ন্যাট। 'পাখিগুলো জানালার চৌকাঠে ছিল, শুনছ? ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে।'

এমন সময় প্যাসেজে, বাচ্চাদের ঘর থেকে ভেসে এল ভয়ার্ত চিৎকার।

'জিল,' শব্দে ঘুম টুটে গেছে ন্যাটের স্ত্রীর, উঠে বসেছে বিছানায়। 'শিগ্‌গির যাও। দেখো কী হলো মেয়েটার।'

মোম জ্বালল ন্যাট, বেডরুমের দরজা খুলে পা বাড়িয়েছে প্যাসেজে, এক ঝলক বাতাস নিভিয়ে দিল বাতি।

আতঙ্কিত আর্তনাদ শোনা গেল আবার, এবার দু'টি বাচ্চা একসঙ্গে চিৎকার করছে। হোঁচট খেতে খেতে ওদের ঘরে ঢুকল ন্যাট, অন্ধকারে টের পেল ডানার ঝটপটানি। জানালা হাট করে খোলা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ঢুকছে ভিতরে, প্রথমে বাড়ি খাচ্ছে ঘরের ছাদে এবং দেয়ালে, তারপর উড়ন্ত অবস্থায় বাঁক নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বাচ্চাদের বিছানা লক্ষ্য করে।

'ভয় নেই, আমি এসে পড়েছি,' চেঁচাল ন্যাট। বাচ্চারা কাঁদতে কাঁদতে বিছানা থেকে লাফ দিল, জড়িয়ে ধরল তাদের বাবাকে। অন্ধকারে পাখিগুলো টার্গেট হিসেবে বেছে নিল ন্যাটকে। 'কী হয়েছে, ন্যাট, কী হয়েছে?' বেডরুম থেকে জোর গলায় ডাকল তার স্ত্রী। সন্তানদেরকে ধাক্কা দিয়ে প্যাসেজে বের করে দিল

ন্যাট। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। বাচ্চাদের শোয়ার ঘরে সে এখন একা। আর আছে পাখিগুলো।

হাতের কাছের বিছানা থেকে একটা কম্বল টেনে নিল ন্যাট, ডানে-বামে, শূন্যে ঘোরাতে লাগল। টের পেল কম্বলের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে পাখিগুলো, শব্দ হচ্ছে থ্যাচ্ করে, কিন্তু রণেভঙ্গ দিল না ওরা। বাড়ি খেয়ে দেয়ালে ছিটকে পড়ছে একটা, পরক্ষণে তেড়ে আসছে পাঁচটা। কামড় বসাচ্ছে, ঠোকর দিচ্ছে ন্যাটের হাতে, মাথায়। ছুঁচাল কাঁটা চামচের মত ধারাল ওদের ঠোঁট। আত্মরক্ষার অস্ত্র কম্বলটা মাথায় বেঁধে নিল ন্যাট। এবার খালি হাতে শুরু করল লড়াই। দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছে না। পাখিগুলো ওর পিছন পিছন বেরিয়ে পড়তে পারে ঘর থেকে।

অন্ধকারে কতক্ষণ লড়াই চালিয়ে গেছে জানে না ন্যাট, তবে অবশেষে ডানা ঝাপটানোর শব্দ কমে এল, একসময় আর শোনা গেল না। দাঁড়িয়ে রইল ন্যাট, কান খাড়া; বেডরুম থেকে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। বন্ধ হয়ে গেছে ডানা ঝাপটানোর ভীতিকর শব্দ।

কম্বলটা দিয়ে চোখও বেঁধে রেখেছিল ন্যাট। কম্বলের বাঁধন খুলল। তাকাল চারদিকে। ঠাণ্ডা, ধূসর ভোরের আলো ঢুকেছে ঘরে। সকাল হয়ে গেছে বলে কেটে পড়েছে পাখিগুলো। মৃতগুলো মেঝের উপর। ক্ষুদে লাশগুলোর দিকে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকল ন্যাট। হতভম্বও। সবগুলোই আকারে ছোট, কমপক্ষে পঞ্চাশটা হবে সংখ্যায়। আছে দোয়েল, ফিঞ্চ, চড়ুই, ব্লু টিট এবং ব্রাম্বলিং। প্রাকৃতিক নিয়মে এরা যে যার অঞ্চলে দল বেঁধে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনায় এক হয়েছিল সবাই। কয়েকটা পাখির গা থেকে ঝরে গেছে পালক, কিছুর ঠোঁটে রক্ত। ন্যাটের রক্ত।

অসুস্থ বোধ করল ন্যাট, জানালার ধারে গেল। তাকাল মাঠ

আর বাগানের দিকে।

ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছে। তুষার জমেছে মাটিতে। সাদা নয়, কালো। এ তুষার ভোরের সূর্যের আলোয় ঝলমল করে না। পুবালি বাতাস বয়ে এনেছে কালো তুষার। জোয়ারের টানে ফুঁসে উঠেছে সাগর, মাথায় সাদা ফেনার মুকুট পরে সজোরে আছড়ে পড়ছে উপকূলে। কোথাও একটিও পাখি দেখা যাচ্ছে না। বাগানের গেটে নেই চড়ুইর কিচিরমিচির, মিশেল থ্রাশ কিংবা ব্ল্যাক বার্ড ঘাসের বুকে খুঁজছে না পোকা। পুবালি বাতাস আর ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া নিস্তব্ধ প্রকৃতি।

ছোট বেডরুমটার দরজা ও জানালা বন্ধ করল ন্যাট। প্যাসেজ পার হয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। ওর স্ত্রী বসে আছে বিছানায়, একটি বাচ্চা ঘুমাচ্ছে তার পাশে, ছোটটি কোলে, মুখে ব্যান্ডেজ। জানালায় শক্ত করে গোঁজা পর্দা, জ্বলছে মোমবাতি। হলদে আলোয় ঝলমলে দেখাচ্ছে চেহারা। মাথা নেড়ে কথা বলতে নিষেধ করল সে। 'ছেলেটা এইমাত্র ঘুমিয়েছে,' ফিসফিস করল মহিলা। 'কোন কিছুতে বাড়ি খেয়েছে ও। চোখের কোণে রক্ত ছিল। জিল বলল পাখি। ঘুম থেকে জেগে দেখে ঘরভর্তি পাখি।'

ন্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে সে, মেয়ের কথা সত্যি কিনা জানতে চাইছে। তাকে আতঙ্কিত লাগছে, হতবুদ্ধি। ন্যাট ইচ্ছে করেই চেপে গেল সে-ও পাখির হামলার শিকার হয়েছিল, ঘণ্টা খানেক আগে।

'ওই ঘরে অনেকগুলো পাখি মরে পড়ে আছে,' বলল ন্যাট। 'পঞ্চাশটার মত। নানা জাতের ছোট ছোট পাখি। পুবালি বাতাসে পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল যেন ওগুলোকে।' স্ত্রীর পাশে বসল। হাত ধরল। 'আবহাওয়ার কারণে এমনটা ঘটেছে। পাখিগুলো বোধহয় এ অঞ্চলের নয়। দূর থেকে এসেছে। তাড়িয়ে এনেছে

বাজে আবহাওয়া।' 'কিন্তু ন্যাট,' গলার স্বর নীচু ওর স্ত্রীর। 'আবহাওয়া তো শুধু কাল রাতে খারাপ হয়েছে এমন কোনও তুষারপাত হয়নি যে তাড়া খেয়ে ওরা এসেছে। ওরা ক্ষুধার্তও নয়। মাঠে ওদের জন্য প্রচুর খাবার আছে।'

'আবাহাওয়া,' পুনরাবৃত্তি করল ন্যাট। 'আমি বলছি, আবহাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে।'

ওর চেহারাও ওর বউ'র মত। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। একমুহূর্ত একজন অপরজনের চোখে চেয়ে থাকল কোনও কথা না বলে। 'নীচে যাচ্ছি আমি। চা খাব,' বলল ন্যাট।

কিচেন বহাল তবিয়তে আছে দেখে স্বস্তি পেল সে। কাপ-প্লেটগুলো সুন্দরভাবে সাজানো টেবিলের উপর। স্ত্রীর উল বোনার জিনিসপত্র বাস্কেট চেয়ারে। বাচ্চাদের খেলনা কাবার্ডের এক কোনায়। সব ঠিক আছে।

ঝুঁকল ন্যাট, লাকড়ি বের করে আগুন জ্বালল ফায়ার প্লেসে। জ্বলন্ত কাঠের টুকরোগুলো যেন নিয়ে এল স্বাভাবিকতা, ধোঁয়া ওঠা কেতলি আর বাদামী রঙের টিপট আরাম ও নিরাপত্তার প্রতীক। চা খেল ন্যাট, বউ'র জন্য একটা কাপ নিয়ে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে নিল বাসন-মাজার ঘরে। পায়ে গলাল বুট। তারপর খুলল খিড়কির দরজা।

আকাশের রঙ সীসার মত। গত কালও সে বাদামী রঙের পাহাড়ের গায়ে ঝলসাচ্ছিল রোদ, আজ দেখাচ্ছে কালো ও নগ্ন। খুরের মত গাছ-গাছালির উপর আক্রমণ চালিয়েছে পুবালি বাতাস। মাটিতে স্তূপ হয়ে আছে শুকনো পাতা, মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে উঠে পড়ছে শূন্যে, কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ছে এদিক-ওদিক। জুতো পরা পা দিয়ে মাটিতে লাথি কষাল ন্যাট। বরফ জমা কঠিন জমিন। এত দ্রুত প্রকৃতি বদলে যায়। জীবনেও

দেখেনি কিংবা শোনেনি ও। এক রাতের মধ্যে জেঁকে বসেছে কালো শীতকাল।

ঘুম থেকে জেগে গেছে বাচ্চারা। উপরতলায় বসে বাক বাকুম করে চলেছে জিল, ছোটটা, জনি, আবার তারস্বরে জুড়ে দিয়েছে কান্না। স্ত্রীর গলা শুনতে পেল ন্যাট, বাচ্চাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। একটু পর নীচে নেমে এল ওরা। নাশতা তৈরি। শুরু হয়ে গেল দিনের রুটিন। 'তুমি পাখিগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল জিল। শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। আগুন, দিনের আলো আর বাবার তৈরি নাশতা ওর মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে।

'হ্যাঁ, কেটে পড়েছে সব ক'টা,' জবাব দিল ন্যাট। 'পুবের বাতাসের টানে ওরা এসে পড়েছিল এদিকে। পথ হারিয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। খুঁজছিল আশ্রয়।'

'আমাদেরকে ঠোকর দেয়ার চেষ্টা করছিল ওরা,' বলল জিল। 'আরেকটু হলে জনির চোখটা যেত।'

'ভয়ের চোটে অমন করেছে,' ব্যাখ্যা করল ন্যাট। 'অন্ধকার ঘরে বুঝতে পারছিল না কোথায় এসেছে।'

'আর কখনও না এলেই বাঁচি,' বলল জিল। 'জানালার বাইরে খাবার রাখব ওদের জন্য। খেয়ে হয়তো চলে যাবে।'

নাশতা শেষ করল জিল। কোট আর হুড পরতে চলে গেল। স্কুলে যাবে। ন্যাট কিছু বলল না। তার স্ত্রী টেবিলের ওপাশ দিয়ে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে। নীরবে কথা হয়ে গেল দু'জনের। 'ওকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আসব আমি,' বলল ন্যাট। 'আজ আর খামারে যাব না।'

জিল মুখ ধুচ্ছে, ন্যাট বউকে বলল, 'সবগুলো জানালা বন্ধ করে রাখবে, দরজাও। একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি। কাল রাতে কোথাও কিছু ঘটেছে কিনা জানা দরকার।' ছোট মেয়েকে

নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। গতরাতের কথা বোধহয় ভুলে গেছে জিল। নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে বাপের সামনে, ছুটছে বাতাসে ভেসে বেড়ানো শুকনো পাতার পিছনে, হুডের নীচে ওর মুখখানা ঠাণ্ডা বাতাসে গোলাপি।

'বরফ পড়বে নাকি, বাবা?' জানতে চাইল সে। 'কী ঠাণ্ডা?'

'নাহ্,' জবাব দিল বাপ। 'বরফ পড়বে না। এবারের শীতে সাদা বরফ দেখতে পাবে না তুমি, কালো তুষার দেখবে।'

ঝোপঝাড়, মাঠ, বাগান, খামারের ওপাশে ছোট জঙ্গল সবখানে ন্যাটের চঞ্চল চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যা খুঁজল, পেল না। একটি পাখিও নেই কোথাও।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো বাচ্চা, সবার মাথায় জিলের মত হুড, ঠাণ্ডার কামড়ে মুখ সাদা।

জিল হাত নাড়তে নাড়তে দৌড়ে গেল ওদের কাছে। 'আমার বাবা বলেছে বরফ পড়বে না। এবারে কালো শীতকাল হবে।'

পাখি নিয়ে কোনও কথা বলল না বাচ্চাটা। আরেকটা মেয়ের সঙ্গে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে। পাহাড় থেকে স্বচ্ছন্দ গতিতে নেমে এল বাস। ন্যাট দেখল তার মেয়ে ঢুকে পড়েছে বাসে, ঘুরল সে, হাঁটা দিল খামারের দিকে। আজ তার কাজ নেই। তবু সব ঠিক আছে কিনা দেখে আসবে একবার। গোয়ালা জিমকে দেখল উঠোনে।

'বস আছেন?' জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'বাজারে গেছেন,' জানাল জিম। 'আজ মঙ্গলবার, না?'

দ্রুত পা চালিয়ে একটা চালা ঘরের অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ন্যাটের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই তার। কাজ আছে। ন্যাট ভুলেই গিয়েছিল আজ মঙ্গলবার। এতেই বোঝা যায় গত রাতের ঘটনা ওকে কতটা নাড়া দিয়েছে। খামার-বাড়ির খিড়কি দরজায়

চলে এল ও। শুনতে পেল রান্নাঘরে রেডিওর বাজনার সাথে তাল মিলিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন মিসেস ট্রিগ।

'মিসাস আছেন নাকি?' ডাকল ন্যাট।

দোরগোড়ায় আবির্ভাব ঘটল হাসিখুশি চেহারার, লম্বা-চওড়া এক মহিলার।

'হ্যালো, মি. হোকেন,' বললেন তিনি। 'বলুন তো এই ঠাণ্ডাটা আসছে কোত্থেকে? রাশিয়া থেকে? আবহাওয়ার এরকম হঠাৎ পরিবর্তন কতদিন দেখিনি আমি। রেডিওতে বলল আরও শীত পড়বে। আর্কটিকে নাকি কী হয়েছে সে জন্য এমন ঠাণ্ডা পড়ছে।

'সকালে রেডিও শোনা হয়নি,' বলল ন্যাট। 'রাতে একটা ঝামেলা হয়ে গিয়েছিল বাসায়।'

'বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো?'

'না...' ন্যাট বুঝতে পারছে না কীভাবে ব্যাখ্যা করবে ঘটনাটা। দিনের আলোতে পাখির সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ও অবান্তর শোনাবে।

মিসেস ট্রিগকে ঘটনাটা বলল বটে তবে মহিলার চাউনি দেখে বুঝতে পারল তিনি ওর কথা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছেন দুঃস্বপ্ন দেখেছে ন্যাট।

'ওগুলো নিশ্চয় আসল পাখির মত ছিল?' হাসছেন তিনি। 'পালক-টালকসহ। লোকে ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত আকারের যে সব পাখি দেখে সেরকম অবশ্যই নয়, তাই না?'

'মিসেস ট্রিগ,' বলল ন্যাট। 'পঞ্চাশটির মত পাখি ছিল। রবিন, রেনসহ আরও হরেক রকম পাখি। বাচ্চাদের শোয়ার ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল। আমার উপর হামলা চালিয়েছে; জনির চোখ উপড়ে নিতে চেয়েছিল।'

মিসেস ট্রিগ স্থির দৃষ্টিতে দেখলেন ন্যাটকে, চোখে সন্দেহ।

'আবহাওয়ার কারণে হয়তো এসেছে,' বললেন তিনি। 'আর্কটিক থেকে আসতে পারে।'

'না,' বলল ন্যাট। 'সাধারণ পাখি। প্রতিদিন যেগুলোকে দেখেন।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো!' বললেন মিসেস ট্রিগ। 'ব্যাখ্যার অতীত, সত্যি। আপনি বরং গার্ডিয়ান পত্রিকায় চিঠি লিখুন। ওরা আপনাকে তথ্য দিতে পারবে। আমি আসি। কাজ আছে।'

মুচকি হেসে রান্নাঘরে ফিরে গেলেন তিনি।

অসন্তুষ্ট ন্যাট চলে এল খামার-বাড়ির গেটে। বেডরুমের মেঝেতে যদি মরা শরীরগুলো পড়ে না থাকত, যেগুলোকে এখন কবর দেবে ও, ন্যাটের কাছেও গল্পটা অতিরঞ্জিত মনে হত।

জিমকে দেখল দাঁড়িয়ে আছে গেটে।

'পাখি নিয়ে কোনও ঝামেলায় পড়েছ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'পাখি? কীসের পাখি?'

'গত রাতে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। অনেকগুলো। বাচ্চাদের বেডরুমে ঢুকে যায়। খুবই হিংস্র স্বভাবের পাখি।'

'আচ্ছা?' যে কোনও জিনিস নিজের মাথায় ঢুকতে সময় লাগে। 'হিংস্র কোনও পাখি-টাখির কথা শুনিনি,' অবশেষে বলল সে। 'ওরা তো শান্ত প্রকৃতির হয়। জানালার ধারে মাঝে মধ্যে আসতে দেখেছি রুটির টুকরো-টাকরা খাওয়ার জন্য।'

'গত রাতের পাখিগুলো মোটেই শান্ত প্রকৃতির ছিল না।'

'ছিল না? তা হলে হয়তো ঠাণ্ডার কারণে হিংস্র হয়েছে। খিদে পেয়েছিল। আপনি জানালার পাশে রুটির টুকরো টাকরা রেখে দেবেন।'

মিসেস ট্রিগের মতই এ ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ করা গেল না জিমের মধ্যে। এ যেন যুদ্ধে এয়ার-রেইডের মত, ভাবল ন্যাট। এ

অঞ্চলের লোকে কোনও দিনই উপলব্ধি করতে পারবে না প্লিমাউথের মানুষকে কতটা ভোগান্তি সইতে হয়েছে।

বাড়ি ফিরে এল ন্যাট। ওর স্ত্রী রান্নাঘরে। কোলে জনি।

'কারও সঙ্গে দেখা হলো?' জানতে চাইল স্ত্রী।

'মিসেস ট্রিগ আর জিম,' জবাব দিল ন্যাট। 'কেউই আমার কথা বিশ্বাস করেনি। তবে ওদিকে কিছু ঘটেনি।'

'পাখিগুলোকে সরিয়ে ফেললে পারতে,' বলল ওর স্ত্রী। 'বাচ্চাদের বিছানা করব। কিন্তু ও ঘরে ঢুকতে ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিছু নেই,' বলল ন্যাট। 'ওগুলো তো মরা।'

একটা বস্তা নিয়ে বেডরুমে ঢুকল ন্যাট। শক্ত শরীরগুলো ছুঁড়ে ফেলল ওটার ভিতরে। মোট পঞ্চাশটা। ঝোপ ঝাড়ের সাধারণ পাখি সবক'টা, আকারে থ্রাশের চেয়েও ছোট। ভয়ের চোটেই বোধহয় এদিকে এসে পড়েছিল। ব্লুটিট, রেন, এদের ছোট ছোট ঠোঁটের শক্তির কথা মনে পড়লে অবিশ্বাস্য লাগে। ন্যাটের মুখ আর হাত ঠুকরে মাংস তুলে দিয়েছে এই খুদে পাখিগুলো। বস্তাটা নিয়ে বাগানে চলে এল ও। এখন সবচেয়ে বড় ঝামেলার কাজ। লোহার মত শক্ত মাটি খুঁড়বে কীভাবে? বরফ পড়েনি, শুধু পুব দিক থেকে বাতাস বয়েছে, অথচ জমিন যেন জমাট বেঁধে গেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। রেডিওতে বোধহয় ঠিকই বলেছে। আর্কটিক সার্কেলের সাথে এ আবহাওয়ার একটা যোগাযোগ আছে।

বস্তা হাতে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাট, খুরের মত ধারাল, হিম বাতাস যেন ওর হাড়ে পোঁচ বসিয়ে যাচ্ছে। মাথায় সাদা ফেনার মুকুট নিয়ে তীরে মাথা কুটছে সাগর। সিদ্ধান্ত নিল ন্যাট ওখানে কবর দেবে পাখিগুলোরকে।

অন্তরীপের নীচে, সৈকতে চলে এল ও। বাতাসের ধাক্কায়

দাঁড়িয়ে থাকা দায়। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে ন্যাটের, নীল হয়ে গেছে হাত। প্রচণ্ড শীত পড়তে দেখেছে ন্যাট। কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া ঠাণ্ডার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ভাটার সময়। শক্ত, অমসৃণ নুড়ি সৈকত জুড়ে। কুঁজো হয়ে এগোল ন্যাট। নরম বালুময় একটা জায়গা খুঁজে নিল। বাতাসের দিকে পিঠ, বুটের ছুঁচাল ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে একটা গর্ত করে ফেলল। এটার মধ্যে পাখিগুলোকে ফেলবে। কিন্তু বস্তার মুখ খোলামাত্র বাতাসের তীব্র ঝাপটা উড়িয়ে নিয়ে গেল ওগুলোকে। আবার যেন পাখা মেলেছে মরা পাখির দল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল তীরে।

'জোয়ার এলে ভেসে যাবে ওরা,' মনে মনে বলল ন্যাট।

সাগরের দিকে তাকাল। সাদা ফেনার মুকুট পরা ঢেউ ফুঁসে উঠে আবার ভেঙে গেল। ভাটার কারণে গর্জনটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। অনেক দূরে ঢেউগুলো।

এরপর ওদেরকে দেখতে পেল ন্যাট। শঙ্খচিল। বসে আছে ঢেউয়ের উপর।

সাদা ফেনার মুকুট ভেবেছিল ন্যাট, আসলে ওগুলো শঙ্খচিল। শত শত, হাজার হাজার, লাখ লাখ...সাগরের ঢেউয়ের তালে নামছে, উঠছে, যেন প্রকাণ্ড নৌবহর নোঙর করে আছে সাগরের বুকে, অপেক্ষা করছে জোয়ারের জন্য। পুব-পশ্চিমে, সবখানে ওরা। যতদূর চোখ গেল সাদা সাদা শঙ্খচিল দেখতে পেল ন্যাট। সাগর শান্ত থাকলে এতক্ষণে গোটা উপকূল সাদা র মত ঢেকে ফেলত ওরা, মাথায় মাথা, গায়ে গা লাগিয়ে। পুবালি বাতাসের চাপে তীরে আসতে পারছে না।

ঘুরল ন্যাট, ফিরে চলল বাড়িতে। ঘটনাটা কাউকে জানানো দরকার। পুবালি বাতাস আর আবহাওয়ার কারণে কিছু একটা ঘটছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ন্যাট। বাস স্টপের টেলিফোন বুদে

গিয়ে পুলিশে ফোন করবে কিনা একবার। কিন্তু কে কী করতে পারবে? লাখ লাখ শঙ্খচিল ছুটে আসছে উপকূলে। খিদে আর ঝড় ওদেরকে তাড়িয়ে এনেছে এদিকে। বললে পুলিশ ওকে পাগল ভাববে নয়তো মাতাল অথবা শক্ত ভঙ্গিতে ওর বক্তব্য শুনে মন্তব্য করবে, 'ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ঘটনাটা ইতিমধ্যে শুনেছি আমরা। কঠিন আবহাওয়ার কারণেই পাখিগুলো ভিতরে ঢুকে পড়ছে।' চারপাশে একবার চোখ বুলাল ন্যাট। অন্য কোনও পাখির চিহ্নও নেই। ঠাণ্ডা সইতে না পেরে কি চলে গেছে সবাই?

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ন্যাটের স্ত্রী। স্বামীকে দেখে উত্তেজিত গলায় বলল, 'ন্যাট, রেডিওতে এইমাত্র বিশেষ খবর প্রচার হয়েছে। আমি লিখে রেখেছি।'

'কী বলল খবরে?' জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'পাখি নিয়ে,' জবাব দিল ওর বউ। 'শুধু এদিকে নয়, সবখানে দেখা গেছে পাখি। লন্ডনসহ দেশের সব জায়গায়। পাখিগুলোর যেন কী হয়েছে।'

ওরা এক সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকল। টেবিলে রাখা কাগজটা পড়ল ন্যাট।

'আজ সকাল এগারোটায় হোম অফিস থেকে আসা স্টেটমেন্ট। সারা দেশ থেকে খবর আসছে। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে সর্বত্র শত শত পাখি দেখা যাচ্ছে। ওরা আসছে কাতারে কাতারে, হাঁটা চলায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, সুযোগ পেলে লোকের উপর হামলাও চালিয়ে বসছে। ধারণা করা হচ্ছে, সুমেরু বায়ু স্রোত, যা এ মুহূর্তে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ব্রিটিশ আইলের উপর দিয়ে, পাখিগুলোকে বাধ্য করেছে দক্ষিণে মাইগ্রেট করার জন্য, তীব্র খিদের কারণে এরা হয়তো মানুষকে আক্রমণ করছে। গৃহস্থদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে তাঁরা যেন জানালা, দরজা

বন্ধ রাখেন, লক্ষ রাখেন চিমনির দিকে এবং শিশুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সাবধান থাকেন। আরও স্টেটমেন্ট প্রচার করা হবে পরবর্তীতে।

এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছে ন্যাট; বউ'র দিকে তাকাল জ্বলজ্বলে চোখে। 'এবার যদি খামারের লোকগুলোর আমার কথা বিশ্বাস হয়! এটা যে গল্প নয় বুঝতে পারবেন মিসেস ট্রিগ। সারা দেশে ঘটছে ব্যাপারটা। সকাল থেকে আমার মন কুডাক ডাকছিল। সাগর তীরে গিয়ে দেখি লাখ লাখ শঙ্খচিল, গায়ে গা ঠেকানো, একটা পিন রাখার জায়গা নেই, ঢেউয়ের উপর ভাসছে, অপেক্ষা করছে।'

'কীসের জন্য অপেক্ষা করছে, ন্যাট?' জিজ্ঞেস করল বউ।

স্থির চোখে স্ত্রীকে দেখল ন্যাট, তারপর দৃষ্টি ফেরাল কাগজের টুকরোয়।

'আমি জানি না,' আস্তে আস্তে বলল সে। 'খবরে বলছে ওরা ক্ষুধার্ত।'

ড্রয়ার খুলে হাতুড়ি আর যন্ত্রপাতি বের করল ন্যাট।

'কী করছ, ন্যাট?'

'জানালা আর চিমনিতে তক্তা বসাব।'

'জানালা বন্ধ থাকলেও ওরা ভেঙে ঘরে ঢুকবে? ওই চড়ুই আর দোয়েল পাখি? কীভাবে তা সম্ভব?'

জবাব দিল না ন্যাট। দোয়েল বা চড়ুই নিয়ে ভাবছে না সে, ভাবছে শঙ্খচিলদের নিয়ে...

উপর তলায় উঠে এল ও। বাকি সকালটা ব্যয় করল বেডরুমের জানালায় বাড়তি কাঠ লাগিয়ে আর চিমনির নীচের অংশটা বুজিয়ে দিয়ে। কাজ করার সময় যুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ন্যাটের। প্লিমাউথে ব্ল্যাক আউটের সময় মা'র

বাড়ির দরজা-জানালায় আলগা তক্তা লাগিয়ে দিয়েছিল সে যাতে বাইরে থেকে ঘরের আলো দেখা না যায়। শেল্টারও তৈরি করেছিল ন্যাট। তবে আসল সময়ে কাজে লাগেনি। খামার-বাড়িতে ওরা এরকম কোনও ব্যবস্থা নেবে কী? ভাবল ন্যাট। সন্দেহ আছে। হ্যারী ট্রিগ এবং তাঁর মিসেস হেসেই উড়িয়ে দেবেন এরকম প্রস্তাব।

'খাবার রেডি,' রান্নাঘর থেকে ঘোষণা দিল ন্যাটের স্ত্রী।

'আচ্ছা। আসছি।'

নির্জের কাজে সন্তুষ্ট ন্যাট। ছোট ছোট শার্সির উপরে এবং চিমনির মুখে কাঠের ফ্রেমগুলো চমৎকার ফিট করেছে।

খাওয়া শেষে মুখটুখ ধুয়ে রেডিও ছাড়ল ন্যাট। একটা বাজে। একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হলো, সকালে যা বলা হয়েছিল। তবে নিউজ বুলেটিনে ঘোষক জানাল, 'ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। দশটার সময় লন্ডনের আকাশ পাখিদের কারণে দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল বিরাট একখণ্ড কালো মেঘে ঢেকে আছে নগরী।'

'পাখিগুলো আশ্রয় নিয়েছে ছাদে, জানালার তাক এবং চিমনির উপরে। এসব পাখির মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাকবার্ড, থ্রাশ, চড়ুই, প্রচুর পরিমাণে কবুতর ও স্টার্লিং। এ ছাড়া কালো মাথার শঙ্খচিল। অস্বাভাবিক দৃশ্যটা দেখার জন্য গাড়ি থামানোর কারণে অনেক জায়গায় বেঁধে গেছে ট্রাফিক জ্যাম, দোকান এবং অফিসের কাজ কর্ম ফেলে লোকে বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, ফুটপাথ পর্যন্ত ভরে গেছে উৎসুক পথচারী ও দর্শকদের কারণে।'

ঘোষক আরও বলল ঠাণ্ডা এবং খিদের কারণেই নাকি এত পাখির আগমন। লোকজনকে আবারও সাবধানে থাকার পরামর্শ দেয়া হলো। ঘোষকের গলা শুনে ন্যাটের মনে হলো লোকটা

গোটা ব্যাপারকে একটা মস্ত ঠাট্টা ধরে নিয়েছে। এর মত লোকের অভাব নেই যারা এটাকে গ্রাহ্যই করতে চায় না। অন্ধকারে হিংস্র হয়ে ওঠা পাখির সাথে লড়াই করতে কেমন লাগে এরা জানে না। নির্বাচনী রাতের মত আজ রাতেও লন্ডনে যথারীতি পার্টি বসবে। মৌজ-মস্তিতে মেতে উঠবে লোকজন। মাতাল হয়ে হাসতে হাসতে বলবে, 'এসো, ভায়ারা! পাখি দেখে যাও?'

রেডিওর সুইচ অফ করে দিল ন্যাট। সিধে হলো। রান্নাঘরের জানালায় ফ্রেম লাগানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জনিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে স্বামীর কাজ দেখছে স্ত্রী।

'এখানে বোর্ড লাগাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কারণ আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না,' জবাব দিল ন্যাট। 'ওদের একটা কাজ করা উচিত,' বলল ন্যাটের বউ। 'সেনাবাহিনী তলব করে পাখিগুলোকে গুলি করলেই হয়। ভয়ে পালিয়ে যাবে সবাই।'

'কীভাবে করবে শুনি?' প্রশ্ন করল ন্যাট।

'ডকে সৈন্যবাহিনী তো আছেই,' জবাব দিল ওর বউ। 'ওদেরকে খবর দিলেই চুকে যায় ঝামেলা।'

'না, যায় না,' বলল ন্যাট। 'লন্ডনের লোক সংখ্যা আশি লাখের উপরে। এ শহরে বিল্ডিং, ফ্ল্যাট আর বাড়ির অভাব নেই। ওদের কি এত সেনাবল আছে যে প্রতিটি বাড়ির ছাদ থেকে গুলি করে পাখি তাড়িয়ে দিতে পারবে?'

'জানি না। তবে কিছু একটা তো করতেই হবে। কিছু একটা ওদের অবশ্যই করা উচিত।'

ন্যাট ভাবল 'ওরা' এ মুহূর্তে নিশ্চয় কিছু একটা করার কথা ভাবছে, তবে 'ওরা' যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, কোনও লাভ হবে না। লন্ডনবাসীকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে নিজে নিজে।

'ভাঁড়ার ঘরে খাবারদাবার আছে কী রকম?' জানতে চাইল ন্যাট।

'আমি বাসি খাবার ঘরে রাখি না জানোই তো,' জবাব দিল স্ত্রী।

'কাল বাজার করার দিন। কাল কিছু খাবার কিনে আনব।'

ন্যাট ওর বউকে আতঙ্কিত করে তুলতে চায় না। কাল ওর শহরে না-ও যাওয়া হতে পারে। ভাঁড়ার ঘরে ঢুকল ন্যাট। কাবার্ডে টিনের মধ্যে ময়দা, মাখন ইত্যাদি রেখে দেয় ওর স্ত্রী। মাখন টাখন আছে মোটামুটি। তবে রুটি ফুরিয়ে এসেছে।

'রুটিঅলা কবে আসবে?'

'কাল।'

একটা টিনে ময়দা দেখতে পেল ন্যাট। রুটিঅলা কাল না এলেও চলে যাবে। যেটুকু ময়দা আছে, রুটি বানানোর জন্য যথেষ্ট।

'পুরানো দিনের মত কিছু খাবার আমাদের সঞ্চয় করে রাখা উচিত,' পরামর্শ দিল ন্যাট। 'সমস্যায় পড়লে খাওয়া যাবে।'

'চেষ্টা করেছিলাম,' জানাল বউ। 'কিন্তু বাচ্চারা টিনের মাছ খেতে চায় না। তাজা মাছ না হলে ওদের মুখে রোচে না।'

রান্নাঘরের জানালায় আবার তক্তা লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ন্যাট। মোমবাতি। বাড়িতে মোমবাতির স্বল্পতাও রয়েছে। এ জিনিসটাও ওর বউ নিশ্চয় কাল কিনবে ভেবে রেখেছে। আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। তবে...

খিড়কির দরজা খুলে বাগানে চলে এল ন্যাট। তাকাল সাগরের দিকে। সারা দিন আজ সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। এখন, বেলা তিনটার সময় এক ধরনের অন্ধকার নেমে এসেছে, আকাশের চেহারা গম্ভীর, ভারী, লবণের মত বর্ণহীন। পাহাড়ের

গায়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যায়। রাস্তা ধরে এগোল ন্যাট। সৈকতের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। জোয়ার এসেছে। দুপুরে তীরের যে পাথরগুলো দেখে গেছে ও, ওগুলো এখন জলের তলায়। তবে সাগর নয়, ওর চোখ শঙ্খচিলের দিকে। সাগরের বুক থেকে উঠে আসছে। হাজারে হাজারে। ডানা মেলে বৃত্তাকারে ঘুরছে। ওদের কারণে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে আকাশ, সৃষ্টি হয়েছে ভৌতিক আঁধারের। শব্দ করছে না পাখিগুলো। নীরব। সাগরের বুক থেকে উপরে উঠছে ওরা, তৈরি করছে বৃত্ত, বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছে নীচে। শক্তি সঞ্চয় করে উঠে আসছে আবার।

ঘুরল ন্যাট। দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এল বাড়ি।

'আমি জিলকে আনতে গেলাম,' বলল ও। 'বাসস্টপে।'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ওর স্ত্রী। 'তোমার মুখ সাদা কেন?'

'জনিকে নিয়ে ভিতরে যাও,' বলল ন্যাট। 'দরজা বন্ধ করে রাখবে। আলো জ্বালিয়ে টেনে দেবে পর্দা।'

'মাত্র তিনটা বাজে,' বলল ওর স্ত্রী।

'তাতে কিছু আসে যায় না। যা বললাম করো।'

খিড়কি দরজার বাইরে টুলশেডে উঁকি দিল ন্যাট। ব্যবহার করা যায় এমন কিছু চোখে পড়ল না। কোদালটা বেশি ভারী, কর্কটা কাজে আসবে না। আগাছা সাফ করার নিড়ানিটা তুলে নিল ও। এটা সহজে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, উদ্দেশ্যও পূরণ হবে।

বাসস্টপের দিকে হাঁটা দিল ন্যাট। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনটা দেখল।

শঙ্খচিলের দল আরও উপরে উঠে এসেছে, আকারে বড় হয়েছে বৃত্ত, বিস্তৃত হয়ে, বিশাল কাঠামো নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে

শূন্যে।

গতি দ্রুত হলো ন্যাটের; যদিও জানে চারটের আগে আসবে না বাস। রাস্তায় দেখা হলো না কারও সঙ্গে। এতে বরং ভালই হলো। এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নয়।

পাহাড়ের উপরে উঠে এল ন্যাট। অপেক্ষা করছে। অনেক আগে এসে পড়েছে। বাস আসতে এখনও আধঘণ্টা বাকি। উঁচু জমিনের মাঠ থেকে শোঁ শোঁ শব্দে ধেয়ে আসছে পুবের বাতাস। দূরে মাটির পাহাড়। বিবর্ণ আকাশের গায়ে সাদা ও পরিষ্কার দেখাচ্ছে। ওগুলোর পিছন থেকে কালো মত কী একটা উঠে এল, নোংরা একটা দাগ, ওটা প্রশস্ত হচ্ছে, চওড়া এবং ঘন, দাগটা পরিণত হলো মেঘে, ওটা আরও পাঁচটা মেঘের মধ্যে ডাইভ দিয়ে পড়ল, ছড়িয়ে যাচ্ছে উত্তর, পুব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে। ওগুলো আদৌ মেঘ নয়; পাখি, সবগুলো পাখি। আকাশের বুকে উড়ে চলেছে ওরা, একটা ঝাঁক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, মাটি থেকে দু'তিনশো ফুট উঁচুতে, ন্যাট ওদের গতি লক্ষ করে বুঝতে পারল পাখিগুলো ইংলন্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। দলে আছে রুক, কাক, দাঁড়কাক, ম্যাগপাই, জে। সবগুলোই সাধারণত ছোট হাতের শিকার ধরে, তবে আজকের বিকেলে ওরা উড়ে চলেছে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে।

'ওরা শহরে যাচ্ছে,' ভাবল ন্যাট, 'জানে কী করতে হবে। শঙ্খচিলেরা আমাদের উপর হামলা চালাবে। অন্যগুলো শহরে।'

টেলিফোন বুদে ঢুকল ন্যাট, রিসিভার তুলল। এক্সচেঞ্জের লোকে ওর বক্তব্য প্রচার করে দেবে।

'আমি হাইওয়ে থেকে বলছি,' জানাল ন্যাট, 'বাসস্টপের সামনে। পাখিদের বিশাল একটা ঝাঁক উড়ে যেতে দেখলাম শহরের দিকে। শঙ্খচিলেরা উপকূলে জড়ো হচ্ছে।'

'আচ্ছা,' ভেসে এল ক্লান্ত একটা কণ্ঠ

'আপনি খবরটা জায়গামত পৌঁছে দিতে পারবেন?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ,..' এবার অধৈর্য শোনাল, ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে।

বাস উঠে এল পাহাড়ে। তিন/চারটা বাচ্চার সঙ্গে লাফিয়ে নামল জিল। শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল বাস।

'নিড়ানি কীসের জন্য, বাবা?'

বাচ্চাগুলো ঘিরে ধরেছে ন্যাটকে, হাসছে, আঙুল তুলে যন্ত্রটা দেখাচ্ছে।

'এমনি নিয়ে এলাম,' বলল ন্যাট। 'বাড়ি চলো। ঠাণ্ডা পড়েছে। খেলতে হবে না। এই যে তুমি, মাঠ ধরে ছোটো তো। দেখি কেমন দৌড়াতে পারো।'

জিলের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে ন্যাট। এরা কাউন্সিল হাউজে থাকে। শর্টকাট রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে বাড়ি।

'আমরা এখন লেনে খেলব,' বলল একজন।

'না। খেলবে না। বাড়ি যাও। নয়তো তোমার মা'র কাছে নালিশ করব।'

ফিসফিস করে কথা বলল ওরা নিজেদের মধ্যে, তারপর মাঠ ধরে ছুটল। জিল বাবার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মুখ গম্ভীর।

'আমরা সবসময় লেনে খেলা করি,' বলল সে।

'আজ খেলার দরকার নেই,' বলল ন্যাট। 'বাড়ি চলো। সময় নষ্ট কোরো না।'

শঙ্খচিলদেরকে দেখতে পাচ্ছে ন্যাট, চক্কর দিচ্ছে মাঠের উপরে। এখনও নিশ্চুপ। কোনও আওয়াজ করছে না।

‘দেখো, বাবা, কত্ত শঙ্খচিল!’

‘দেখেছি। জলদি চলো।’

‘ওরা কোথায় যাচ্ছে?’

‘শহরে। ওখানে ঠাণ্ডা কম।’

জিলের হাত চেপে ধরল ন্যাট, লেন বা সরু গলিপথ ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলল।

‘এত জোরে হাঁটছ কেন? আমি পারছি না।’

শঙ্খচিলগুলো রুক আর কাকের মত, কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে, ঝাঁক বেঁধে, হাজারে হাজারে ছুটে চলেছে চার কোণে।

‘বাবা, শঙ্খচিলগুলো করছে কী?’

কাক এবং দাঁড়কাকের মত চলে যায়নি ওরা, মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। খুব বেশি উঁচুতেও নেই। যেন সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে। যেন কোনও সিদ্ধান্ত এখনও দেয়া হয়নি।

‘তুমি পিঠে উঠবে, জিল? এসো। পিঠে চড়ে বসো।’

মেয়েকে পিঠে তুলে নিল ন্যাট দ্রুত ছোটার জন্য। কিন্তু ভুল করেছে ও। জিলের ওজন কম নয়। তার উপর বইপত্রের বোঝা তো আছেই। জিল বারবার পিছলে যাচ্ছে। বাপের ভয় সংক্রামিত হয়েছে মেয়ের মধ্যেও।

‘শঙ্খচিলগুলোকে ভাল লাগছে না আমার,’ বলল জিল। ‘ওগুলো আরও কাছিয়ে আসছে।’

মেয়েকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিল ন্যাট। দৌড়াতে লাগল। পিছন পিছন জিল। খামার পার হওয়ার সময় দেখল মি. ট্রিগ গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছেন।

‘আমাদেরকে একটা লিফট দেবেন?’ ডাকল ন্যাট।

‘কী হয়েছে?’

ড্রাইভিং সীটে বসা মি. ট্রিগ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। হাসিহাসি

মুখ। ‘তুমি শঙ্খচিলগুলোকে দেখেছ? জিম আর আমি ওদেরকে উড়িয়ে দেব। সবাই হঠাৎ করে পাখি নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। সবার মুখে শুধু পাখি আর পাখি। শুনলাম তোমাদের নাকি পাখি হামলা করেছিল। বন্দুক লাগবে?’ মাথা নাড়ল ন্যাট।

ছোট গাড়িটিতে মাল বোঝাই। জিল কোন মতে পিছনের সীটে, পেট্রলের টিনের উপর গুটিশুটি মেরে বসতে পারলে যেতে পারবে।

‘বন্দুক লাগবে না,’ বলল ন্যাট, ‘জিলকে বাড়ি পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। ও পাখি ভয় পায়।’

মেয়ের সামনে আর কিছু বলতে চাইল না ন্যাট।

‘ঠিক আছে,’ বললেন মি. ট্রিগ। ‘ওকে বাড়ি পৌঁছে দেব। তুমি আমাদের পাখি শিকার উৎসবে যোগ দাও না কেন? মজা হবে।’

গাড়িতে উঠে বসল জিল। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে লেন ধরে ছুটে চললেন ড্রাইভার। ন্যাট তাকিয়ে রইল ওদিকে।

ট্রিগের মাথার ঠিক নেই। এক আকাশ পাখির বিরুদ্ধে একটা বন্দুক কী কাজে আসবে?

বাড়ির দিকে জোর কদমে এগোল ন্যাট। মি. ট্রিগ গাড়ি নিয়ে এদিকেই আসছেন। ন্যাটের পাশে থেমে গেল গাড়ি একটা ঝাঁকি খেয়ে।

‘বাচ্চাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি,’ বললেন তিনি। ‘তোমার স্ত্রী পথ চেয়ে বসেছিল মেয়ের জন্য। ব্যাপারটা নিয়ে কী ভাবছেন? শহরের লোকে বলছে এটা নাকি রাশানদের কাণ্ড। রাশানরা বিষ খাইয়েছে পাখিগুলোকে।’

‘বিষ খাওয়াবে কীভাবে?’ প্রশ্ন করল ন্যাট।

‘আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। গুজব কীভাবে ছড়ায় জানোই

তো। আমার শুটিং ম্যাচে আসছেন তো?'

'না। বাড়িতে থাকব। নইলে বউ খুব দুশ্চিন্তা করবে।'

'আমার বউ বলে পাখিগুলোকে ধরে ধরে খাওয়া উচিত,' বললেন ট্রিগ। 'আমরা শঙ্খচিল পুড়িয়ে খাব, ঝোল রেঁধে খাব, আচার বানাব। দাঁড়াও না কয়েকটাকে গুলি করে ফেলে দিই। তারপর দেখেন বাকিগুলো কীভাবে কেটে পড়ে।'

'জানালায় বোর্ড লাগিয়েছেন?' জানতে চাইল ন্যাট।

'না। এসবের কোনও মানে হয় না। বেতারের কাজ খালি ভয় দেখানো। জানালায় বোর্ড লাগানোর চেয়ে অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে আমার।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে কিন্তু কাজটা করতাম।'

'ধ্যাত। তুমি খামোকা ভয় পাচ্ছ। আমার বাড়িতে ঘুমাতে আসবে?'

'না। ধন্যবাদ। লাভ নেই।'

'ঠিক আছে। কাল সকালে দেখা হবে। তোমাকে শঙ্খচিল দিয়ে নাশতা খাওয়াব।'

দাঁত বের করে হাসলেন ট্রিগ, গাড়ি নিয়ে এগোলেন খামারের ফটক অভিমুখে।

দ্রুত পা চালাল ন্যাট। ছোট্ট জঙ্গলটা পার হয়ে এল, পাশ কাটাল পুরানো গোলাবাড়ি, তারপর চলল মাঠের দিকে।

ডানা ঝাপটানোর শব্দে চমকে উঠল ন্যাট। আকাশ থেকে কালো ঠোঁটের একটা শঙ্খচিল ঝাঁপ দিল ওকে লক্ষ্য করে। মিস হলো টার্গেট। পাক খেয়ে আবার উঠে গেল শূন্যে। ওটার সঙ্গে যোগ দিল ডজন খানেক শঙ্খচিল এবং হেরিং। হাতের নিড়ানি ফেলে দিল ন্যাট। এটা কাজে আসবে না। হাত দিয়ে মাথা ঢেকে দৌড়াল বাড়ির দিকে। পাখিগুলো ধাওয়া করল

ন্যাটকে। মাথার উপর ডানা ঝাপটানোর ভয়ঙ্কর পতপত শব্দ। ঠোকর দিতে লাগল ওরা। ন্যাটের হাত, কব্জি ও ঘাড় রক্তাক্ত হয়ে উঠল। প্রতিটি ঠোকরে গা থেকে মাংস তুলে নিচ্ছে ওরা। চোখ বাঁচাতে হবে ন্যাটকে। গায়ে যত ইচ্ছা ঠোকরাক, চোখে আঘাত লাগতে দেয়া যাবে না। 'ওরা এখনও জানে না কীভাবে ঝুলে থাকতে হয় কাঁধে, একযোগে মাথা লক্ষ্য করে ডাইভ দিতে হয়। তবে প্রতিটি ডাইভে, প্রতিটি হামলার পর আরও সাহসী হয়ে উঠছে পাখিগুলো। নিজেদের কথা ভাবছে না মোটেই। টার্গেট মিস হয়ে গেলে আছড়ে পড়ছে শক্ত জমিনে, ভেঙে যাচ্ছে ডানা। দৌড়াতে দৌড়াতে হোঁচট খেতে লাগল ন্যাট, লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে সামনে পড়ে থাকা আহত শরীরগুলো।

দরজার সামনে চলে এল ন্যাট, রক্তাক্ত হাতে বাড়ি দিল কপাটে। জানালায় তক্তা লাগানো বলে ভিতরে ঢুকতে পারছে না আলো। অন্ধকার।

'দরজা খোলো,' চিৎকার করছে ও, 'আমি ন্যাট, শিগ্গির দরজা খোলো।'

ওর চিৎকার শুনতে পেল মাথার উপর চক্কর দেয়া পাখিগুলো। প্রকাণ্ড গানেটটাকে চোখে পড়ল ন্যাটের। বিশাল রাজহংস ওকে লক্ষ্য করে ডাইভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শঙ্খচিলগুলো চেঁচামেচি করছে, ধাক্কা খাচ্ছে একটা আরেকটার সঙ্গে। তারপর চলে গেল। শুধু গানেটটা রইল। হঠাৎ শরীরের সঙ্গে ভাঁজ হয়ে এল ডানা, জমিন লক্ষ্য করে ছুটে এল ওটা একটা পাথর খণ্ডের মত। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল ন্যাট, খুলে গেল দরজা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে দোরগোড়ায়, ওর স্ত্রী একটানে ভিতরে নিয়ে গেল ওকে।

ধপ করে একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা। মাটিতে আছড়ে পড়েছে গানেট।

ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিল ন্যাটের স্ত্রী। তেমন গভীর নয় ক্ষত। হাতের পিছন এবং কব্জি বেশি কেটেছে, ছড়েছে। ক্যাপ না থাকলে মাথাটাও বাঁচানো যেত না। গানেটটা ফুটো করে দিত খুলি।

বাচ্চারা কাঁদছে। বাবার হাতে রক্ত দেখেছে ওরা।

'এখন কোনও সমস্যা নেই,' বলল ন্যাট। 'লাগেনি তো আমার। শুধু কয়েক জায়গায় সামান্য কেটে ছড়ে গেছে। তুমি জনির সাথে খেলা করো, জিল। মা রক্ত ধুয়ে দেবে।'

কিচেনের পাশের ঘরের দরজা ভিজিয়ে রাখল ন্যাট যাতে দেখতে না পায় বাচ্চারা। ওর স্ত্রীর মুখ ফ্যাকাসে। সিঙ্কের কল ছেড়ে দিয়েছে সে। 'ওদেরকে দেখেছি আমি,' ফিসফিস করল বউ। 'জিল দৌড়ে ঘরে ঢুকল। দেখলাম মাথার উপর জড়ো হচ্ছে ওরা। প্রচণ্ড রাগে জোরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। জ্যাম হয়ে গিয়েছিল দরজা। তাই তুমি প্রথমবার ধাক্কা দেয়ার সময় খুলতে পারিনি।'

কিচেনে ঢুকল ন্যাট, পিছন পিছন ওর স্ত্রী। জনি চুপচাপ খেলছে মেঝেতে বসে। জিলের চেহারায় উদ্বেগ।

'পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বাবা,' বলল সে। 'শোনো।'

কান পাতল ন্যাট। জানালা এবং দরজা থেকে ভোঁতা, অস্পষ্ট শব্দ আসছে। ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, জানালা-দরজার গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে, নখের আঁচড় কাটছে, পিছলে যাচ্ছে, ভিতরে ঢোকার রাস্তা খুঁজছে। মাঝে মাঝে ঠাস বা থ্যাচ করে শব্দ হলো, কোনও পাখি ডাইভ দিয়েছিল, বাড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। 'এভাবে মরবে কিছু,' ভাবল ন্যাট। তবে বেশি নয়।

জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখল ন্যাট। নিখুঁত কাজ ওর।

প্রতিটি ফাটল কিংবা গর্ত বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য আরও কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে। সে মেঝেতে পড়ে থাকা কাঠের গোঁজ, পুরানো টিনের টুকরো, তক্তার ফালি, ধাতব খণ্ড ইত্যাদি জোগাড় করে জানালা ও দরজার বোর্ডের উপর পেরেক ঠুকে লাগিয়ে দিল। হাতুড়ির শব্দে ঢাকা পড়ে গেল পাখিদের নানা সুরের চিৎকার–স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকে ন্যাট কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে দিতে চায় না। 'রেডিওটা চালাও,' বলল ও। 'রেডিও শুনব।'

রেডিওর শব্দেও পাখিদের ডাক চাপা পরে যাবে অনেকটাই। উপরে, বেডরুমে চলে এল ন্যাট। জানালাগুলোয় টিন, তক্তার ফালি ইত্যাদি লাগিয়ে দিল। এখন ছাদ থেকে পাখিদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে ন্যাট। নখের আঁচড়, পিছলে পড়া, পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা।

ম্যাট্রেস নীচে নিয়ে এল ন্যাট। ভয় ঘনাল ওর স্ত্রীর চোখে। ভেবেছে দোতলার জানালা ভেঙে ঢুকে পড়েছে পাখি।

'আজ রাতে সবাই কিচেনে ঘুমাব,' খুশি খুশি গলায় বলল ন্যাট। 'আগুনের পাশে আরামে ঘুমাতে পারব। জানালায় পাখির খচরমচর শব্দেও সমস্যা নেই।'

বাচ্চাদের নিয়ে আসবাবগুলো নতুন করে সাজাল সে। জানালার কাছে নিয়ে গেল ড্রেসার। সেফগার্ড হিসেবে কাজ করবে। ম্যাট্রেসগুলো বিছাল এরপর, একটার পাশে আরেকটা, ড্রেসারটা সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, তার দেয়াল ঘেঁষে।

'এখন আমরা যথেষ্ট নিরাপদ, ভাবল ন্যাট। এয়াররেইড সেন্টারের মত। শুধু খাবার নিয়ে চিন্তা। খাবার আর আগুনের জন্য কয়লা। যা খাবার আছে তাতে দু'তিনদিন চলে যাবে। তারপর...'

তারপর কী হবে ভেবে লাভ নেই। রেডিওতে ঘোষণা শুরু

হবে। কী করতে হবে বলবে। তবে এ মুহূর্তে নাচের মিউজিক চলছে। এ সময়ে এ ধরনের মিউজিক চালানো অস্বাভাবিক। ন্যাটের মনে পড়ল লন্ডনে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণের সময় একবার এ ধরনের মিউজিক চালানো হয়েছিল। যুদ্ধের সময় বিবিসি লন্ডনে ছিল না। অন্য জায়গা থেকে স্বল্প সময়ের জন্য প্রোগ্রাম চালাত। আজ আবার সেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ভাবছে ন্যাট। রান্নাঘরে, দরজা-জানালা বন্ধ অবস্থায় ভাল থাকবে ওরা। অন্তত শহরের চেয়ে। ভাগ্যিস, ওরা শহরে নেই।

ছ'টার সময় থেমে গেল রেকর্ড। টাইম সিগনাল দেয়া হয়েছে। বাচ্চারা ভয় পাবে, তবু খবরটা শোনা দরকার। কয়েক সেকেন্ড পিপ পিপ শব্দের পর এক মুহূর্ত বিরতি। তারপর ভেসে এল ঘোষকের কণ্ঠ। গম্ভীর, বিষণ্ন। দুপুরের থেকে একদম আলাদা। 'লন্ডন থেকে বলছি,' বলল সে। 'আজ বিকেল চারটায় জাতীয় জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছে। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে সকলের বোঝা উচিত চট করে কাজটা করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক এ সমস্যার সময়। প্রতিটি লোককে যার যার বাড়িতে সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্টে, যেখানে অসংখ্য মানুষের বাস, একত্রিত হয়ে বাড়ির ভিতরে পাখিদের প্রবেশের চেষ্টা রুখে দেবেন। বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রতিটি মানুষ আজ রাতে ঘরে থাকবেন, কেউ রাস্তায় বেরুবেন না। বিপুল সংখ্যার পাখিরা কাউকে দেখলেই হামলা চালিয়ে বসছে, দালান-কোঠাতেও তারা আক্রমণ চালাচ্ছে; তবে সতর্ক থাকলে এদেরকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। জনগণকে শান্ত থাকতে বলা হচ্ছে, আতঙ্কিত হবেন না। খুব বেশি জরুরী পরিস্থিতি ছাড়া কাল সকাল সাতটার আগে আর প্রচার করা হবে

না খবর।'

জাতীয় সঙ্গীত বাজাল রেডিও। সুইচ অফ করে দিল ন্যাট। চাইল স্ত্রীর দিকে। ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'খবরে কী বলল?' জানতে চাইল জিল।

'আজ রাতে আর কোনও প্রোগ্রাম নেই।' বলল ন্যাট। 'বিবিসির একটু সমস্যা হয়েছে।'

'পাখিগুলোর জন্য?' জিজ্ঞেস করল জিল। 'পাখিরা সমস্যা করেছে?'

'না,' জবাব দিল ন্যাট, 'সবাই ব্যস্ত। তবে পাখিরা শহরে কিছু সমস্যা যে করছে না তা নয়। যাকগে, একটা রাত রেডিও না শুনলেও চলবে।'

'আমাদের একটা গ্রামোফোন থাকলে বেশ হত,' বলল জিল। মুখ ফেরাল ড্রেসারের দিকে। না শোনার ভান করলেও জানালায় পাখিদের নখের আঁচড়, অনবরত ঠক ঠক, ডানা ঝাপটানোর শব্দ অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

'আজ সাপারটা একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব আমরা,' ঘোষণা দিল ন্যাট। 'টোস্টেজ চীজ চলবে তো? আমরা সবাই এ খাবারটা পছন্দ করি, না?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল ন্যাট। জিলের চেহারা থেকে আতঙ্কের ভাবটা দূর করে দিতে চায়।

বউকে সাপার বানাতে সাহায্য করল ন্যাট। শিস দিচ্ছে, গাইছে, তবে জানালার কাঁচে খচরমচর শব্দটা আগের মত আর তীক্ষ্ণ নয়। বেডরুমে চলে এল ও, কান পাতল। ছাদ থেকেও কোনও শব্দ আসছে না। 'ওরা জানে এখানে ঢোকা সহজ হবে না,' ভাবছে ন্যাট। 'তাই অন্য কোথাও চেষ্টা করছে। আমাদের পিছনে সময় নষ্ট করতে চায় না।'

সাপারটা নির্বিঘ্নেই সারা গেল। কোনও ঘটনা ঘটল না। মুখটুখ ধুচ্ছে ওরা, নতুন একটা শব্দ শুনতে পেল। পরিচিত আওয়াজ—গুনগুন শব্দ তুলছে।

ন্যাটের দিকে মুখ তুলে চাইল ওর বউ, উজ্জ্বল চেহারা। 'প্লেন। ওরা পাখিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য প্লেন পাঠিয়েছে। এবার ওদের রক্ষা নেই। গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?'

সমুদ্রের দিক থেকে শব্দ আসছে। গুলির আওয়াজ হতে পারে। নিশ্চিত নয় ন্যাট। নৌবাহিনীর প্লেন হয়তো শঙ্খচিলগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু ওগুলো তো অন্তরীপে চলে গেছে। তীরে গুলি চালাতে পারবে না ওরা। ওখানে মানুষজন থাকে।

'প্লেনের শব্দ শুনতে ভাল লাগছে না?' মন্তব্য করল ন্যাটের স্ত্রী। জনিকে নিয়ে লাফাতে শুরু করেছে জিল। 'প্লেনগুলো মেরে ফেলবে পাখিগুলোকে। গুলি করে অক্কা পাইয়ে দেবে।'

ঠিক তখন প্রায় মাইল দুই দূরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল, তার পরপরই দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টা। গুনগুন শব্দটা ক্রমে মিলিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে।

'কীসের শব্দ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাটের স্ত্রী। 'পাখিদের উপর বোমা ফেলছে?'

'জানি না,' জবাব দিল ন্যাট। 'তবে মনে হয় তা নয়।' বউকে ও বলেনি বিস্ফোরণের শব্দটা আসলে প্লেন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আওয়াজ। কর্তৃপক্ষ প্লেন পাঠিয়েছে পাখি মারার জন্য। কিন্তু প্রপেলার আর ফিউজিলাজের মধ্যে পাখি ঢুকে প্লেন ক্রাশ হয়ে গেলে আর কী করার থাকে? সারা দেশেই হয়তো এমনটা ঘটছে।

'প্লেনগুলো কই গেল, বাবা?' জানতে চাইল জিল।

'ওদের বাসায় ফিরে গেছে,' বলল ন্যাট। 'এসো, বিছানা করে

ফেলি।'

ওর স্ত্রী ব্যস্ত থাকল বিছানা পাতা আর বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর কাজে, ন্যাট এই ফাঁকে বাড়ির চার পাশে একটা চক্কর দিয়ে এল। তক্তা-টক্তা কোথাও আলগা হয়ে গেছে কিনা পরখ করে দেখল। প্লেনের আওয়াজ আর নেই, নৌবাহিনীর গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। 'খামোকা জীবন আর শ্রম নষ্ট,' আপন মনে বলছে ন্যাট। 'এভাবে ওদেরকে ধ্বংস করা যাবে না। মাস্টার্ড গ্যাস দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে আগে আমাদেরকে সাবধান করতে হবে। আজ রাতে দেশের সেরা মাথাগুলো নিশ্চয় এর পিছনে কাজ করবেন।'

ভাবনাটা এক ধরনের নিশ্চয়তা এনে দিল ন্যাটের মধ্যে। কল্পনায় দেখল দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, প্রকৃতিবিদ আর টেকনিশিয়ানরা পরামর্শ সভা ডেকেছেন; সমস্যাটার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করছেন।

উপরতলার বেডরুমে কোনও শব্দ নেই। জানালায় খচরমচর শোনা যাচ্ছে না। হয়তো সাময়িক যুদ্ধ বিরতি এটা। নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করছে ওরা, ভাবল ন্যাট। বাতাস বইছে এখনও। চিমনির মধ্যে গর্জাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে ও। সৈকতে সগর্জনে আছড়ে পড়ছে সাগর। এখন জোয়ারের সময় হয়তো জোয়ারের কারণে যুদ্ধ বিরতি দিয়েছে পাখির দল। প্রকৃতির কিছু নিয়ম কানুন ওরা মেনে চলে।

ঘড়ি দেখল ন্যাট। প্রায় আটটা বাজে। এক ঘণ্টা আগে শুরু হয়েছে জোয়ার। পাখিদের নীরবতার কারণ বুঝতে পারছে ন্যাট: জোয়ারের শিকার হয়েছে ওরা। শহরে এ ব্যাপারটা নেই, কিন্তু উপকূলে আছে। সময়ের হিসেবটা মাথায় ঢুকে রাখল ন্যাট। আরও ঘণ্টা ছয় নিরাপদে থাকবে ওরা। রাত সোয়া একটার দিকে

আবার শুরু হবে জোয়ার, ভেসে যাওয়া পাখিরা ফিরে আসবে ওই সময়....

এখন দুটো কাজ করতে পারে ন্যাট। স্ত্রী আর বাচ্চাদের সঙ্গে বিশ্রাম নিতে পারে। ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নেবে। দ্বিতীয়টি হলো খামারে গিয়ে দেখে আসতে পারে ওখানকার পরিস্থিতি, ফোন ঠিক থাকলে এক্সচেঞ্জ থেকে খবরও হয়তো পাবে। মৃদু গলায় বউকে ডাকল ন্যাট। বাচ্চাদেরকে মাত্র ঘুম পাড়িয়েছে সে। সিঁড়ি বেয়ে অর্ধেক নেমেছে, পরিকল্পনাটা ফিসফিস করে তাকে বলল ন্যাট।

'তুমি যাবে না,' সাফ জানিয়ে দিল স্ত্রী, 'আমাকে আর একলা রেখে কোথাও যাওয়া চলবে না তোমার। আমি কিছুতেই একা থাকতে পারব না।'

গলার স্বর চড়ে গেল তার, ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরে বউকে শান্ত করল ন্যাট। 'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সাতটার সময় খবর শুনব। তবে সকালে ভাটা শুরু হয়ে গেলে খামারে একবার যেতেই হবে। রুটি, আলু আর দুধ নিয়ে আসব।'

মস্তিষ্ক আবার চালু হয়ে গেল ন্যাটের। জরুরী অবস্থা নিয়ে চিন্তা করছে। আজ সন্ধ্যায় খামারে দুধ দোয়ানো হয়েছে কিনা সন্দেহ। ট্রিগ গরুগুলোকে গোয়াল ঘরে সাবধানে রেখেছেন কিনা কে জানে। ন্যাটকে তিনি তো পাত্তাই দিতে চাননি। হাসছিলেন বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। গাড়িতে বসা তাঁর চেহারাটা মনে পড়ছে ন্যাটের।

বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে। ওদের মা ম্যাট্রেসে বসা, নার্ভাস চোখে তাকিয়ে আছে স্বামীর দিকে।

'তুমি কী করছ?' ফিসফিস করল সে।

বউকে চুপ করে থাকতে ইশারা করল ন্যাট। আস্তে আস্তে, কোনও শব্দ না করে খুলে ফেলল খিড়কির দরজা। তাকাল বাইরে।

কালি গোলা অন্ধকার। সাগর থেকে তীব্র হিমেল ঝাপটা নিয়ে ছুটে আসছে বাতাস। দরজার বাইরের সিঁড়িতে লাথি কষাল ন্যাট। ধাপের উপর পড়ে আছে মরা পাখি। পাখির লাশ ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। জানালার নীচে, দেয়ালে। ঘাড় ভাঙা সবক'টার। এগুলো হলো ডাইভ দেয়া পাখি। এক রোখা। আত্মহননে ভয় নেই। চারপাশে চোখ বুলাল ন্যাট। শুধুই মরা পাখি। একটাও জ্যান্ত পাখি নজরে এল না। জোয়ারের টানে সাগরে গেছে। দুপুরের মত শঙ্খচিলগুলো হয়তো এ মুহূর্তে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে দুলছে।

দূরে, পাহাড়ের উপর, দু'দিন আগে যেখানে ট্রাক্টরটা ছিল, ওদিকে দাউদাউ করে কিছু একটা জ্বলছে। এয়ারক্রাফট। বাতাস পেয়ে মশালের মত জ্বলছে।

মরা পাখিগুলোর দিকে আবার তাকাল ন্যাট। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জানালার ধারিতে (Window sill) যদি একটার উপর আরেকটা জড়ো করে রাখে, পরবর্তী হামলার সময় কিছুটা হলেও নিরাপত্তা দেবে লাশগুলো। লাশগুলোকে ঠুকরে কিংবা আঁচড়ে সরাতে হবে আগে, তারপর জ্যান্ত পাখিরা জানালার শার্সিতে হামলা চালানোর সুযোগ পাবে। অন্ধকারে কাজ শুরু করে দিল ন্যাট। লাশ ধরতে ঘেন্না লাগছে। শরীর এখনও গরম, রক্তাক্ত। পালকে লেগে আছে রক্ত। পেট গুলিয়ে উঠল ন্যাটের, তবে কাজ চালিয়ে গেল। চেহারা শুকনো করে দেখল প্রতিটি জানালার শার্সি ফেটে গেছে। শুধু তক্তার কারণে ভিতরে ঢুকতে পারেনি ওরা। ভাঙা এবং ফেটে যাওয়া জানালার কাঁচে রক্তাক্ত

পাখিগুলোকে বসিয়ে দিল ন্যাট।

কাজ শেষ করে ঘরে ঢুকল ও। রান্নাঘরের দরজায় ব্যারিকেড দিল, জোরদার হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা। খুলে ফেলল হাতের ব্যান্ডেজ। পাখির রক্তে চটচটে হয়ে গেছে। নতুন ব্যান্ডেজ বাঁধল।

ওর স্ত্রী কোকো নিয়ে এল। তৃষ্ণার্তের মত পান করল ন্যাট। ভয়ানক পরিশ্রান্ত।

'সব ঠিক আছে,' হাসল ও। 'ভেবো না। আমরা সামলে নিতে পারব।' ম্যাট্রেসে শুয়ে পড়ল ম্যাট। চোখ বুজল। প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। তবে ঘুমটা স্বস্তির হলো না। ঘুমের মধ্যেও মনে হতে লাগল কিছু একটা ভুল করে ফেলেছে ও। একটা কাজ করার দরকার ছিল যেটা করা হয়নি। একটা বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত ছিল, হয়নি। জ্বলন্ত প্লেনের স্বপ্ন দেখল। দুঃস্বপ্নও ওকে জাগিয়ে তুলতে পারল না। জেগে গেল কাঁধে স্ত্রীর ধাক্কা খেয়ে।

'ওরা আবার শুরু করেছে,' ফোঁপাচ্ছে সে, 'কিছুক্ষণ আগে। আমি একা একা আর সহ্য করতে পারিনি। বাজে একটা গন্ধও পাচ্ছি। কিছু বোধহয় পুড়ছে।'

মনে পড়ে গেল ন্যাটের। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে ভুলে গেছে সে। প্রায় নিভু নিভু দশা। লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল ন্যাট, বাতি জ্বালল। জানালা এবং দরজায় যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। তবে ও নিয়ে ভাবছে না ন্যাট। ঝলসানো পালকের গন্ধ ঘরে। সাথে সাথে ব্যাপারটা বুঝে ফেলল ও। চিমনির মধ্য দিয়ে আসছে পাখিগুলো, রান্নাঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

লাকড়ি আর কাগজ আগুনের মধ্যে ফেলল ন্যাট। হাত বাড়াল প্যারাফিনের ক্যানে।

'পিছনে হঠো,' চেঁচাল ন্যাট। তারপর প্যারাফিনের টিন ছুঁড়ে

ফেলল আগুনে। পাইপ বেয়ে উপরে উঠে গেল লকলকে শিখা, ছোবল মারল ঝলসে, কালো হয়ে যাওয়া পাখিগুলোকে।

হৈ চৈ শুনে জেগে গেছে বাচ্চারা, জুড়ে দিয়েছে কান্না। 'কী হয়েছে?' বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল জিল।

জবাব দেয়ার সময় নেই ন্যাটের। চিমনি থেকে টেনে নামাচ্ছে পাখির লাশ, ছুঁড়ে ফেলছে মেঝেতে। শোঁ শোঁ গর্জন ছাড়ছে আগুন, চিমনিতে আগুন ধরে যাওয়ার ঝুঁকি আছে জেনেও কাজটা করছে ন্যাট। শিখার উত্তাপে চিমনির মুখ থেকে সরে যাবে জ্যান্ত পাখিরা। ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল ন্যাট ওরা পুরানো আমলের বাড়িতে বাস করছে বলে। ওদের বাড়ির জানালাগুলো ছোট ছোট, দেয়াল নিরেট। নতুন কাউন্সিল হাউজগুলোর মত নয়। ওইসব বাড়ির বাসিন্দারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া বাঁচতে পারবে কিনা ভেবে সন্দেহ হলো ওর।

'কেঁদো না,' সন্তানদেরকে বলল ন্যাট। 'ভয়ের কিছু নেই। কান্না থামাও।'

আগুনের মধ্যে ঝলসানো পাখিগুলো ধুপধাপ পড়ছে, ওগুলো সরিয়ে ফেলতে লাগল ও।

জানালার তক্তায় পাখিদের নখের আঁচড়, ঠোঁটের ঠক ঠক ইত্যাদি শব্দ ছাপিয়ে ঢংঢং আওয়াজে বেজে উঠল রান্নাঘরের ঘড়ি। তিনটা বাজে। আরও চার ঘণ্টা। জোয়ারের ঠিক নির্দিষ্ট সময়টা জানা নেই ন্যাটের। সাড়ে সাতটা কিংবা পোনে আটটার দিকেও জোয়ার আসতে পারে সাগরে।

'স্টোভটা জ্বালাও,' বলল ন্যাট বউকে। 'আমাদের জন্য চা বানাও, বাচ্চাদেরকে কোকো দাও। খামোকা বসে থেকে লাভ নেই।'

বউকে ব্যস্ত রাখতে হবে, বাচ্চাদেরকেও। খাও, দাও, সময়টা

তো কেটে যাবে।

আগুনের শিখা ম্লান হয়ে আসছে। তবে চিমনি থেকে আর কালো শরীর পড়ছে না। পোকারটাকে যত উঁচুতে পারে ঠেলে দিল ন্যাট। ওটার গায়ে ঠেকল না কিছুই। চিমনি পরিষ্কার। কপালের ঘাম মুছল ন্যাট।

'এসো, জিল,' মেয়েকে ডাকল ও। 'আমাকে কিছু লাকড়ি এনে দাও। আগুনটা ভাল করে জ্বেলে রাখতে হবে।' কিন্তু বাবার ডাক অগ্রাহ্য করল কন্যা। পাখিগুলোর পোড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ বড়বড় করে।

'ওগুলোকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল ন্যাট। 'আগুনটা ভাল করে জ্বালিয়ে নিই তারপর ওগুলোর ব্যবস্থা করছি। প্যাসেজে রেখে আসব।'

চিমনি নিয়ে বিপদ কেটে গেছে। আগুনটা দিন রাত জ্বালিয়ে রাখতে পারলে আর ভয় নেই।

'কাল খামার থেকে আরও কিছু জ্বালানি নিয়ে আসতে হবে,' ভাবছে ন্যাট। 'যেভাবে হোক ম্যানেজ করব। ভাটার সময়টাতে।' ওরা চা, কোকো আর রুটি খেল। শুধু আধখানা রুটি রয়ে গেছে, লক্ষ করেছে ন্যাট। ওরা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, আশা করছে সে।

'থামো,' চামচটা জানালার দিকে তুলে ধরে ধমক দিল ছোট্ট জনি, 'থামো, বুড়ো পাখির দল।'

'ঠিক বলেছ,' হাসছে ন্যাট, 'আমরা বুড়ো ভিখিরিদেরকে দেখতে চাই না, তাই না?'

ওরা হাসি-ঠাট্টা করছে এমন সময় ধপ্ করে একটা শব্দ হলো। সেই আত্মহননকারী পাখিদের একটা।

'আবার ওরা, বাবা,' চেঁচিয়ে উঠল জিন।' 'জানালার উপর

লাফিয়ে পড়েছে।'

'হুঁ,' বলল ন্যাট। 'অক্কা পেয়েছে নিশ্চয়।' স্ত্রীর দিকে ফিরল।

'একটা সিগারেট দাও। ধোঁয়ার গন্ধে পালক পোড়া দুর্গন্ধটা দূর হবে।'

'প্যাকেটে মাত্র দুটো আছে,' জানাল ওর স্ত্রী।

জানালায় খচখচ শব্দটা হয়েই চলেছে অনবরত। বউকে এক হাতে, অন্যহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকল ন্যাট। জনি তার মায়ের কোলে। কম্বলগুলো স্তূপ হয়ে আছে ম্যাট্রেসের উপর।

খচখচ শব্দ থেকে নতুন একটা শব্দ উদয় হলো-থরথর। ধারাল ঠোঁট দিয়ে কেউ ঠোকর দিচ্ছে তক্তার গায়ে। কান খাড়া করল ন্যাট। কাঠঠোকরা নয়। কাঠঠোকরা হালকা এবং ঘন ঘন ঠোকর দেয়। এটা আরও জোরে ঠোকরাচ্ছে। এভাবে চললে কাঁচের মত তক্তারও বারোটা বেজে যাবে। বাজপাখি নয়তো? বাজার্ডরা ঠোঁট এবং নখ একই সঙ্গে ব্যবহার করে। কত রকমের শিকারী পাখি আছে-বাজ, বাজার, চিল, ফ্যালকন-সবগুলোর নাম মনেও পড়ছে না। শিকারী পাখিগুলোর ভয়ঙ্কর শক্তির কথা ভুলেই গিয়েছিল ন্যাট। শঙ্খচিলদেরকে হঠিয়ে ওরাই হয়তো এখন দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সকাল হতে আরও তিন ঘণ্টা বাকি। বাইরে থেকে কাঠ ভাঙার শব্দ ভেসে আসছে। শক্ত ঠোঁটের বাড়িতে ভেঙে যাচ্ছে কাঠ।

আসবাবগুলোর উপর চোখ বুলাল ন্যাট। চিন্তা করছে কোনটা ভেঙে দরজায় ঠেক্ দেয়া যায়। ড্রেসারের কারণে জানালা নিরাপদ। তবে দরজা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে ন্যাট। উপরে উঠে এল ও, ল্যান্ডিং-এ পা রেখেছে, থমকে গেল। বাচ্চাদের শোয়ার ঘরের মেঝেতে টুপটুপ শব্দ। ছোট ছোট পায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

পাখিরা ঢুকে পড়েছে ভিতরে...দরজায় কান পাতল ন্যাট। কোনও সন্দেহ নেই। ডানা ঝাপটানোর শব্দ, মেঝের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে পাখির দল। অপর বেডরুমটাতে এখনও ঢুকতে পারেনি কেউ। ওটাতে ঢুকে পড়ল ন্যাট। আসবাব টেনে আনতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় রাখবে। তবে দরজার সামনে রাখতে পারবে না। কারণ ভিতরে থেকে খোলে ওটা।

'ন্যাট, নীচে এসো।' ডাকল ওর স্ত্রী। 'ওখানে কী করছ?'

'আসছি এখুনি,' বলল ন্যাট। ও চায় না ওর স্ত্রী উপরে আসুক; চায় না বাচ্চাদের বেডরুমে ছোট ছোট পায়ের চলাফেরার শব্দ শুনে ফেলুক, কানে যাক দরজার গায়ে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ।

সাড়ে পাঁচটার দিকে স্ত্রীকে নাশতা বানাতে বলল ন্যাট বেকন আর ফ্রাইড ব্রেড। কাজে ব্যস্ত থাকলে আতঙ্ক কমবে তার। উপরতলার পাখিদের কথা জানে না সে। বেডরুমটা রান্নাঘরের উপরে নয়। হলে শব্দ শুনতে পেত। শুনত কাঠের গায়ে ঠোকরাচ্ছে ওরা, ধুপধাপ আছড়ে পড়ছে হেরিংগালরা। এদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে, শুনেছে ন্যাট। এগুলোর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নেই। আগাপাশতলা বিচার না করে ডাইভ দিয়ে পড়ছে বেডরুম লক্ষ্য করে, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে পটল তুলছে। তবে ব্ল্যাক-ব্যাকগুলো অন্যরকম। তারা জানে তারা কী করছে। মাথায় ঘিলু আছে বাজার্ড এবং বাজ পাখিগুলোরও...

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ন্যাট। ওর থিওরী যদি ঠিক না হয়, জোয়ারের সময় থেমে না যায় হামলা, নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে ওদের। বিশ্রাম, জ্বালানি, খাবার ছাড়া বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। শহরে থাকলে এর চেয়ে নিরাপদে থাকা যেত। খামার-বাড়ির টেলিফোনে যদি খবর পাঠানো যেত ওর

চাচাতো ভাইকে, সে শহরে থাকে। ট্রেনে যেতে অল্প সময় লাগে। একটা গাড়ি ভাড়া করতে পারলেও চলে। জোয়ারের সময় গাড়ি ভাড়া করা গেলে আরও দ্রুত যাওয়া যাবে শহরে।

ঝিমুনি এসে গিয়েছিল ন্যাটের এসব কথা ভাবতে ভাবতে, বৌ'র ডাকে ঘুমের চটকা কেটে গেল।

'কী হয়েছে?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল ন্যাট।

'রেডিও,' বলল ওর স্ত্রী। 'সাতটা প্রায় বাজে।'

'নব ঘুরিয়ো না,' এই প্রথম অধৈর্য শোনাল ন্যাটের কণ্ঠ।

'যে স্টেশনে ধরা আছে থাক। ওরা হোম সার্ভিস থেকে কথা বলবে।'

অপেক্ষা করছে ওরা। ঘড়িতে সাতটা বাজল। রেডিওতে কোনও সাড়া শব্দ নেই। আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে আরেকটা স্টেশন ধরল। একই অবস্থা। খবরের কোনও খবর নেই।

'ভুল শুনেছি আমরা,' মন্তব্য করল ন্যাট, 'আটটার আগে ওরা খবর প্রচার করবে না।'

'ফর্সা হয়ে আসছে,' ফিসফিস করল ওর স্ত্রী। 'দেখা যাচ্ছে না তবে অনুভব করতে পারছি। পাখিগুলোও আগের মত চেঁচামেচি করছে না।'

ঠিকই বলেছে সে। থরথর, ঠকঠক ইত্যাদি শব্দগুলো কমে আসছে প্রতি মুহূর্তে। জানালার ধাড়ি কিংবা সিঁড়িতেও পা ঘষে চলার শব্দ ম্লান হয়ে আসছে। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। আটটা নাগাদ কোনও শব্দই আর শোনা গেল না। শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া। নিশ্চুপ প্রকৃতি চোখে ঘুম এনে দিল বাচ্চাদের। সাড়ে আটটার সময় রেডিও বন্ধ করে দিল ন্যাট। 'ও কী করলে?' বলল ওর স্ত্রী। 'খবরটা মিস করব তো?'

'কোনও খবর হবে না,' বলল ন্যাট। 'নিজেদের উপর নিজেদের ভরসা করতে হবে।'

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ন্যাট, আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলল ব্যারিকেড। খুলল ছিটকিনি। দরজার বাইরের সিঁড়িতে পড়ে থাকা পাখির লাশগুলো লাথি দিয়ে ফেলে দিল। বুক ভরে টানল ঠাণ্ডা বাতাস। ছ'ঘণ্টা কাজ করার সময় পাবে ও, একটা মুহূর্ত বেহুদা নষ্ট করা যাবে না। খাবার, আলো এবং জ্বালানি, এগুলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে জোগাড় করা গেলে আরেকটা রাত টিকে থাকতে পারবে ওরা।

বাগানে নেমে এল ন্যাট, দেখতে পেল জ্যান্ত পাখিগুলোকে। সামুদ্রিক শঙ্খচিল সাগরে ফিরে গেছে জোয়ারের টানে, আগের মতই খাবারের সন্ধানে। তবে জমিনের পাখিরা যায়নি। ওরা অপেক্ষা করছে, দেখছে। ঝোপ, মাটি, গাছের উপর, মাঠে শতশত পাখি। সবাই স্থির। কেউ কিছু করছে না।

ছোট বাগানটার শেষ মাথায় চলে এল ন্যাট। নড়ল না পাখির দল। ওকে দেখছে।

'খাবার জোগাড় করতে হবে আমাকে,' মনে মনে বলল ন্যাট, 'খামার-বাড়ি যাব আমি খাবারের খোঁজে।'

ঘরে ফিরে এল ন্যাট। জানালা দরজায় নজর বুলিয়ে উঠে এল দোতলায়। বাচ্চাদের বেডরুমের দরজা খুলল। খালি। শুধু মেঝের উপর পড়ে আছে মরা কতগুলো পাখি। জ্যান্তগুলো বাইরে, বাগানে এবং মাঠে। নীচে নেমে এল ন্যাট।

'আমি খামারে যাচ্ছি,' বলল ও।

ওর বউ জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। খোলা জানালা দিয়ে দেখেছে সে জ্যান্ত পাখিদেরকে।

'আমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে চলো,' অনুনয় করল সে, 'আমরা এখানে একা থাকতে পারব না। একা থাকার চেয়ে মরে যাব তাও ভাল।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল ন্যাট তারপর মাথা দোলাল।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'চলো তা হলে ঝুড়িগুলো নিয়ো আর জনির প্রামটা। প্রাম ভরে জিনিসপত্র আনতে পারব।'

গায়ে ছুরি চালানোর মত হিমেল বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ওরা গ্লাভ আর স্কার্ফ পরে নিল। জনিকে প্রামে বসাল তার মা, ন্যাট ধরে রাখল জিলের হাত।

'পাখিগুলো,' কাঁদো কাঁদো গলা ন্যাটের স্ত্রীর, 'ওরা মাঠ ভর্তি।'

'ওরা আমাদের উপর হামলা চালাবে না,' অভয় দিল ন্যাট, 'অন্তত দিনের আলোয় নয়।'

মাঠ ধরে হেঁটে চলল ওরা। পাখিগুলো নড়ল না। অপেক্ষা করছে ওরা বাতাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে।

খামারের সামনে চলে এসেছে ওরা, দাঁড়িয়ে পড়ল ন্যাট। বউকে বলল বাচ্চাদেরকে নিয়ে ফণিমনসার ঝোপের নীচে অপেক্ষা করতে।

'কিন্তু আমি মিসেস ট্রিগের সঙ্গে দেখা করব,' প্রতিবাদ করল বউ।

'অনেক জিনিসপত্র নিতে হবে। আমি গেলে...

'এখানেই থাকো,' ধমক দিল ন্যাট। 'আমি আসছি এখুনি।'

উঠানে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরুগুলো। বেড়ার গায়ে একটা ফাটল চোখে পড়ল ন্যাটের। একটা ভেড়া বেরিয়ে পড়েছে ফাটল দিয়ে। খামার-বাড়ির সামনের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। মনের মধ্যে কুডাক ডাকছে ন্যাটের। স্ত্রী ও

বাচ্চাদের নিয়ে খামারে ঢুকতে চায় না ও। ওর স্ত্রী এগিয়ে এসেছিল, কষে ধমক লাগাল তাকে। 'এদিকে নাক গলাতে নিষেধ করেছি না! যা বলেছি করো।'

প্রাম নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল বাচ্চাদের মা। এদিকে বাতাসের ঝাপটা নেই বললেই চলে।

একা খামারের দিকে পা বাড়াল ন্যাট। গরুগুলোর মাঝ দিয়ে পথ করে চলল। দুধ দোয়ানো হয়নি। ফুলে আছে বাঁট। তাই হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে চলেছে জানোয়ারগুলো। গেটের কাছে দেখল গাড়িটাকে, গ্যারেজে ঢোকানো হয়নি। খামার-বাড়ির একটা জানালাও আস্ত নেই। উঠোন এবং বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য শঙ্খচিলের লাশ। জীবিত পাখিগুলো দল বেঁধে বসে আছে খামারের পিছনের গাছে এবং বাড়ির ছাদে। এখনও স্থির। দেখছে ওকে।

জিমের লাশ পড়ে আছে মাটিতে...লাশ না বলে মাংসের দলা বলাই ভাল। পাখিগুলো মাংস খুবলে খাওয়ার পরে গরুর খুরের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে শরীর। বন্দুকটা ওর পাশে। বাড়ির দরজা বন্ধ, ছিটকিনি লাগানো। তবে কাঁচ নেই বলে ভাঙা জানালা টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল ন্যাট। ট্রিগ পড়ে আছেন টেলিফোনের পাশে। ফোন করার সময় বোধহয় পাখিগুলো হামলা করে বসে তাঁকে। রিসিভার ঝুলছে, মিসেস ট্রিগকে দেখা যাচ্ছে না। উনি বোধহয় দোতলায়। ওখানে গিয়ে লাভ আছে? অসুস্থ বোধ করল ন্যাট। জানে দোতলায় গেলে কী দেখবে।

'থ্যাঙ্ক গড,' মনে মনে বলল ন্যাট। 'ওঁদের কোন সন্তান ছিল না।' জোর করে সিঁড়ি বাইতে লাগল ন্যাট, মাঝ পথে এসে আবার নেমে এল। মিসেস ট্রিগের পা দেখেছে ও, বেডরুমের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে। শরীরের পাশে কালো পিঠের

শঙ্খচিলের লাশ আর ভাঙা একটা ছাতা।

বউ আর বাচ্চাদের কাছে ফিরে এল ট্রিগ। বলল, 'আমি গাড়িতে মাল ভরছি। কয়লা আর প্যারাফিন নেব। বাড়িতে জিনিসপত্রগুলো রেখে আবার আসব নতুন মাল নিতে।'

'ট্রিগদের কথা বললে না?' জানতে চাইল ওর স্ত্রী।

'ওঁরা নেই। বোধহয় বন্ধুর বাড়ি গেছেন,' বলল ন্যাট।

'তোমার সঙ্গে হাত লাগাই?'

'দরকার নেই। ওখানে নোংরা আবর্জনা ভরতি। গরু আর ভেড়াগুলো পায়খানা করেছে। দাঁড়াও, গাড়িটা নিয়ে আসি। তোমরা বসতে পারবে।'

উঠান থেকে গাড়ি চালিয়ে লেনে নিয়ে এল ন্যাট। এখান থেকে ওর বউ এবং ছেলেমেয়ে দেখতে পাবে না জিমের লাশ।

'এখানে থাকো,' বলল ন্যাট। 'প্রাম নিয়ে ভাবতে হবে না। প্রামে পরে মাল নেব। আগে গাড়িটা ভরি।'

ন্যাটের বউ সারাক্ষণ লক্ষ করছে স্বামীকে। ও নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। নইলে ভিতরে যাওয়ার জন্য জিদ ধরত।

মোট তিনবার আসতে হলো খামারে প্রয়োজনীয় সব জিনিস নেয়ার জন্য। মোম, প্যারাফিন, পেরেক, টিনের খাবার; তালিকার শেষ নেই। জানালায় আরও তক্তা লাগানোর জন্য কাঠও নিল ন্যাট। তিনটে গরুর দুধ দোয়াল। নইলে যন্ত্রণায় ওরা চিৎকার করতেই থাকত।

শেষ বারের বার গাড়ি নিয়ে বাসস্টপে চলে এল ন্যাট। ঢুকল টেলিফোন বুদে। লাইন কাজ করছে না। বুদ থেকে বেরিয়ে এল ন্যাট। নজর বুলাল চারদিকে। জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। মাঠ বোঝাই শুধু পাখি আর পাখি। কয়েকটা পাখি ঘুমিয়ে পড়েছে

পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে। হঠাৎ কথাটা মনে হলো ন্যাটের। 'ওদের এখন পেট ভর্তি। কাল রাতে প্রচুর খেয়েছে। এ কারণেই আজ সকাল থেকে সবাই নট নড়ন চড়ন...'

কাউন্সিল হাউজগুলোর চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। জিলের বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। আফসোস হলো ন্যাটের। কেন যে বাচ্চাগুলোকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল না!

আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল ন্যাট। বর্ণহীন, ধূসর। ল্যান্ডস্কেপের গাছগুলো নগ্ন, নুয়ে আছে বাতাসের চাপে। ঠাণ্ডা বাতাস কাবু করতে পারেনি মাঠের পাখিগুলোকে।

'ওদেরকে কব্জা করার এটাই মোক্ষম সময়,' ভাবল ন্যাট। 'সারা দেশে নিশ্চয় একই কাণ্ড ঘটিয়েছে ওরা। এয়ারক্রাফটগুলো মাস্টার্ড গ্যাস ছড়িয়ে মেরে ফেলছে না কেন পাখিগুলোকে? গাড়িতে ফিরে এল ন্যাট, বসল ড্রাইভারের আসনে।

'দ্বিতীয় গেটের সামনে দিয়ে দ্রুত যাবে,' ফিসফিস করল ওর স্ত্রী। 'পোস্টম্যানের লাশ পড়ে আছে ওখানে। আমি চাই না জিল দৃশ্যটা দেখুক।'

অ্যাকসিলেরেটরে চাপ দিল ন্যাট। লাফিয়ে উঠল ছোট মরিস। ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল। বাচ্চারা মজা পেয়ে হাসতে লাগল।

পোনে একটায় বাড়ি পৌঁছুল ওরা। আর মাত্র একঘণ্টা বাকি আছে।

'বাচ্চাদেরকে খাইয়ে দাও,' বলল ন্যাট ওর স্ত্রীকে। 'তুমিও খেয়ে নাও। আমার খাওয়ার সময় নেই। জিনিসপত্রগুলো নামাতে হবে।'

মালপত্রগুলো ভিতরে নিয়ে এল ন্যাট। সাজিয়ে রাখা যাবে পরে। সেজন্য দীর্ঘ সময় পড়ে আছে সামনে। আগে জানালা-

দরজা সাইজ করতে হবে।

প্রতিটি জানালা ও দরজা পরীক্ষা করে দেখল ন্যাট। ছাদেও উঠল। প্রতিটি চিমনিতে তক্তা লাগাল, শুধু রান্নাঘর বাদে। এত ঠাণ্ডা, সহ্য করতে পারছে না ন্যাট। কিন্তু কাজ তো শেষ করতেই হবে। মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে তাকাল প্রত্যাশা নিয়ে। এয়ারক্রাফটের দেখা নেই। প্রশাসনকে প্রাণ খুলে গালিগালাজ করল ন্যাট।

'এরকমই হয়ে আসছে সব সময়,' বিড়বিড় করছে ও। 'আমাদেরকে ওরা কখনোই পাত্তা দেয় না। সব সময় শহরের লোকেদের সবকিছুতে অগ্রাধিকার। নিশ্চয় শহরে এয়ারক্রাফট দিয়ে গ্যাস ছিটাচ্ছে ওরা। আর আমরা এখানে নিয়তির হাতে নিজেদেরকে সঁপে দিয়ে বসে আছি।'

বিরতি দিল ন্যাট। বেডরুমের চিমনির কাজ শেষ। তাকাল সাগরের দিকে। কিছু একটা নড়ছে ওখানে। ঢেউয়ের মাঝখানে সাদা ও ধূসর কী যেন।

'নৌবাহিনী,' উৎসাহিত হয়ে উঠল ন্যাট, 'ওরা আমাদের কথা ভাবে। উপকূলের দিকেই আসছে।'

অপেক্ষা করল ন্যাট, চেয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেল চোখ। বাতাসের ঝাপটায় জল চলে এল। অবশেষে ভুলটা বুঝতে পারল ন্যাট। জাহাজ নয়। নৌবাহিনী আসছে না। আসছে শঙ্খচিলের দল। উঠে আসছে যেন সাগরের বুক থেকে। মাঠের পাখিগুলো কীসের ইঙ্গিত পেল কে জানে, উঠে পড়ল শূন্যে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে, এক সঙ্গে। আবার শুরু হয়েছে জোয়ার।

মই বেয়ে নীচে নেমে এল ন্যাট, ঢুকল রান্নাঘরে। খেতে বসেছে ওর পরিবার। দুটোর বেশি বাজে। দরজার ছিটকিনি টেনে দিল ন্যাট, বসাল ব্যারিকেড, তারপর মোমবাতি জ্বালল।

'এখন রাত,' ঘোষণা করল ছোট্ট জনি।

ন্যাটের বউ রেডিও খুলেছিল। কোনও সাড়া শব্দ নেই।

'সবগুলো স্টেশনে নব ঘুরিয়েছি,' জানাল সে। 'কিন্তু কোথাও থেকে কিছু শুনতে পাইনি। এমনকী বিদেশী স্টেশনগুলোও নিশ্চুপ।'

'হয়তো সবাই একই সমস্যায় আছে,' মন্তব্য করল ন্যাট। 'গোটা ইউরোপই হয়তো এখন পাখিদের দখলে।'

স্বামীকে সুপের বাটি এগিয়ে দিল ন্যাটের স্ত্রী রুটিসহ। নীরবে খেল ওরা। জনির থুতনি বেয়ে এক টুকরো রুটি পড়ে গেল টেবিলে।

'ভদ্রভাবে খেতে শেখো, জনি,' ওকে শাসাল জিল। 'নিজেই নিজের মুখ মুছতে শেখো।'

জানালায় আবার শুরু হলো ঠক্‌ঠক্ সেই সাথে দরজায়। জানালার ধারিতে খচখচ, ধাক্কা। সিঁড়িতে ধপ করে কিছু আছড়ে পড়ার শব্দ। সেই বোকা পাখিদের একটা।

'আমেরিকা কি কিছু করতে পারে না?' জিজ্ঞেস করল ন্যাটের স্ত্রী। 'ওরা তো সব সময়ই আমাদের মিত্র, তাই না?'

জবাব দিল না ন্যাট। জানালা এবং চিমনির তক্তাগুলো বেশ শক্ত। বাড়িতে জ্বালানি আর খাবার যা আছে তা দিয়ে আগামী কয়েকটা দিন চালিয়ে নেয়া যাবে। জানালায়, তক্তার সাথে কাঁটা তারের বেড়া লাগিয়ে দেবে ন্যাট। খামার থেকে প্রচুর এনেছে জিনিস। তবে সমস্যা হলো কাজটা করতে হবে অন্ধকারে।

ছোট পাখিগুলো জানালায় সমানে ঠোকর মেরে চলেছে। তবে বাজের দল ব্যস্ত দরজা নিয়ে। ওদের ভয়ানক শক্ত ঠোঁটের আঘাতে তক্তার ছিলকা উঠে যাচ্ছে, শব্দ শুনতে পেল ন্যাট। খুদে মস্তিষ্কে কতটা বুদ্ধি ধরে ভেবে অবাক হলো ন্যাট। ওরা মানব

সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার প্রতিহিংসা নিয়ে নেমেছে। ন্যাট জানে না আর ক'দিন টিকে থাকতে পারবে হিংস্র পাখিগুলোর বিরুদ্ধে।

'শেষ সিগারেটটা দাও,' ন্যাট বলল ওর বউকে। 'খামার-বাড়ি থেকে এ জিনিসটা আনতেই ভুলে গেছি।'

হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিল ন্যাট। অন করল নীরব রেডিওর সুইচ। সিগারেটের খালি প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুনে। দেখছে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ওটা।

নীল কার্পেট

অভ্যর্থনাটা ভালই হলো। কুরাকুইরা উপজাতিরা আসলেই খুব ভদ্র। সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে তাদের গায়ে। যদিও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি তারা। গ্রামের সর্দার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে পারে। অবশ্য আশরাফ চৌধুরীর হয়ে দোভাষীর কাজ করছে ফার্নান্দো। ফার্নান্দোর বাড়ি লাপাজে। কুরাকুইরা তার পূর্বপুরুষের গ্রাম। ফার্নান্দো বয়সে তরুণ, উদ্যমী। তাকে নিয়ে আগেও নানা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছেন অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় প্রফেসর আশরাফ চৌধুরী। তবে আমাজান অভিযান এই প্রথম। কুরাকুইরাদের গ্রামে ফার্নান্দোই তাঁকে নিয়ে এসেছে। গ্রামের ছেলে বলে খাতিরটা বেশি পাচ্ছে ফার্নান্দো, সেই সাথে অতিথি হিসেবে চৌধুরী তো বটেই। তবে এদের গ্রামে চৌধুরীই প্রথম ভিনদেশী নন, এর আগেও অনেক ভিনদেশী এসেছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকা, ডিসকভারি চ্যানেল, প্ল্যানেট অ্যানিমাল চ্যানেলের প্রতিবেদকরা আমাজানের ওপর যখনই সচিত্র প্রতিবেদন রচনা করেছেন, কুরাকুইরাদের গ্রামের কথা বলতে ভোলেননি। বিংশ শতাব্দীর এই শেষ লগ্নে এক সময়ের অজানা আমাজান অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়দের দুঃসাহসিক অভিযানের কারণে আজ আর তেমন অজ্ঞাত, অপরিচিত নয়। অনেকেই জানে কুরাকুইরারা অতিশয় সজ্জন এবং অতিথিপরায়ণ। বিশেষ করে ভিনদেশীদের তারা খুবই সমাদর করে। ভিনদেশী কেউ এলে তারা অত্যন্ত যত্নের সাথে তাকে নিজেদের গ্রাম ঘুরিয়ে দেখায়। যদিও পিঁপড়ে

দেবতাদের মন্দিরের কথা আশরাফ চৌধুরীর জানা ছিল না। সম্ভবত এই মন্দিরের কথা বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারকারীরাও জানেন না। ফার্নান্দোই তাঁকে এই মন্দিরের কথা প্রথম বলেছে। সে নিজেও মন্দির দেখেনি। গল্প শুনেছে শুধু। মন্দিরটা নাকি কাঠের। পালো সান্তো বা পবিত্র বৃক্ষের কাঠ দিয়ে তৈরি। ফার্নান্দো জানায়, এই মন্দিরে কেউ নাকি পাহারায় থাকে না, পিঁপড়েরাই তাদের দেবতাকে পাহারা দিয়ে রাখে। কথাটা শুনে বিশ্বাসই করতে চাননি আশরাফ চৌধুরী, মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার ভেতরের সুপারস্টিশন এখনও যায়নি দেখছি, ফার্নান্দো। জীবনেও শুনিনি পিঁপড়েরা মন্দির পাহারা দেয়!' তাকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে বুঝতে পেরে আহত হয় ফার্নান্দো। বলে, 'বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার, সার। তবে আমার পূর্ব-পুরুষরা কিন্তু এই কুরাকুইরা সম্প্রদায়েরই ছিলেন। আমার ঠাকুরদার কাছে গল্পটা শুনেছি আমি।'

'আমাকে সে মন্দির দেখাতে পারবে তুমি? তবেই তোমার কথা বিশ্বাস করব আমি।' রীতিমত চ্যালেঞ্জের সুরে বলেছিলেন আশরাফ চৌধুরী।

এক মুহূর্ত চুপ করে ছিল ফার্নান্দো। তারপর বলেছিল, 'দেখাতে পারব একটা শর্তে। আপনি এই মন্দিরের কথা কাউকে বলতে পারবেন না। আমরা বাইরের মানুষের কাছে এই মন্দিরের কথা আজতক বলিনি। শুনেছি তা হলে পিঁপড়ে দেবতার অভিশাপ নেমে আসতে পারে।'

'ঠিক আছে। কাউকে বলব না। শুধু এক নজর দেখেই চলে আসব।' তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন আশরাফ চৌধুরী।

কুরাকুইরা বংশের ছেলে এবং চৌদ্দপুরুষের মধ্যে সবচে' শিক্ষিত বলে গ্রামে ফার্নান্দোর বিশেষ খাতির ছিল। তার জন্ম লাপাজে হলেও তার পিতামহ এই গ্রামেরই সর্দার ছিলেন। একবার অজ্ঞাত কারণে আমাজানের জঙ্গলে আগুন লাগে. ভয়াবহ সেই

দাবানলে হাজার হাজার একর বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কুরাকুইরাদের গ্রামের অনেকেই সেই অগ্নিকাণ্ডের কবল থেকে রক্ষা পেতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফার্নান্দোর ঠাকুরদা ছিলেন তাঁদের একজন। এক মিশনারিতে তাঁরা আশ্রয় নেন। তখন ফার্নান্দোর বাবা দুধের শিশু। মিশনারির প্রধানরা ওদেরকে লাপাজে নিয়ে যায়। পরে ওখানেই ফার্নান্দোর ঠাকুরদার চাকুরি হয়। ফার্নান্দোর বাবা বড় হতে থাকে। কিন্তু ঠাকুরদার দেশের জন্যে খুব মন টানছিল। তিনি মাটির টানে ফিরে আসেন নিজের গ্রামে। ফার্নান্দোর বাবা তখন বিয়ে করেছে। শহুরে বউ অজ পাড়াগাঁয়ে আসতে চায়নি। সে চেয়েছে ফার্নান্দো আধুনিক মন-মানসিকতায় বড় হয়ে উঠবে, ভাল চাকুরি করবে। ফার্নান্দোর ঠাকুরদা তেমন জোরাজুরি করেননি। তখন তাঁর অগস্ত্য যাত্রার সময় হয়েছে। নিজের ভিটে-মাটি পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও গ্রামের প্রাচীন মানুষেরা তাদের এক সময়ের সর্দারকে ঠিকই আত্মার টানে বুকে টেনে নিয়েছে। বুড়োর আশা পূরণ হয়েছে। শেষ নিঃশ্বাসটা ফেলেছেন স্বদেশের মাটিতেই।

এদিকে ফার্নান্দো রসায়ন শাস্ত্রের ওপর পড়াশোনা শেষ করেছে লাপাজের এক নামকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর সেখানকার বিভাগীয় প্রধান আশরাফ চৌধুরীর সহকারী হিসেবে যোগ দিয়েছে। তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিল বলে কাজটা আরও সহজ হয় তার জন্য। আশরাফ চৌধুরী সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে আমাজান যাচ্ছেন শুনে লাফিয়ে উঠেছে ফার্নান্দো। প্রফেসর কেমিস্ট্রি পড়ান তবে অ্যাডভেঞ্চারে তাঁর বিপুল আগ্রহ। নৃতত্ত্বের ওপর তার পড়াশোনা আছে প্রচুর, সুযোগ পেলেই নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেরিয়ে পড়েন। কুরাকুইরা গ্রামে যাবার প্রস্তাবটা সে-ই আশরাফ চৌধুরীকে দেয়। পিঁপড়ে দেবতার মন্দিরের কথা শুনে ওই গ্রামে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন চৌধুরী। বিশেষ করে মূর্তির কথা শুনে। খুব দামি পাথর দিয়ে নাকি তৈরি মূর্তিটি। কী পাথর তা জানে না ফার্নান্দো।

জানবে কী করে নিজে দেখলে তো! কিন্তু আশরাফ চৌধুরীকে কথাটা বলে ফেঁসে গেছে। সে জানত না ওই মন্দিরে ভিনদেশীদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঠাকুরদা তাকে মন্দিরের গল্প বলেছে, কিন্তু স্বজাতি ছাড়া অন্য কাউকে সে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা, তা বলেনি। নিজের গ্রামে যাচ্ছে সে, মন্দির দেখবে, এই কথা আনন্দের সাথে যেদিন তার বাবাকে জানাল, বাবা গম্ভীর হয়ে বলল, 'মন্দির দেখবে ভাল কথা। কুরাকুইরা বংশের ছেলে হিসেবে ও মন্দির দেখার তোমার অধিকারও আছে। আশীর্বাদ নিয়ে আসবে পিঁপড়ে দেবতার। কিন্তু খবরদার, বাইরের কাউকে যেন নিয়ে যেয়ো না ওখানে। তা হলে গোটা গ্রামে অভিশাপ নেমে আসবে।'

নিজের বস খানিকটা পাগলাটে স্বভাবের হলেও ফার্নান্দো দেবতা জ্ঞানেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁকেও ওই মন্দিরে নিয়ে যাওয়া যাবে না শুনে সে প্রথমে দমেই গিয়েছিল। তবে আশরাফ চৌধুরী যখন কথা দিলেন মন্দিরের ভেতর ঢুকবেন না, শুধু এক নজর দেখে চলে আসবেন, ফার্নান্দো ভাবল তাতে এমন কী ক্ষতি হবে। সারকে নিজের চেয়েও বিশ্বাস করে। জানে তাঁর বা তাঁর গ্রামের মানুষের অসুবিধে হয় এমন কাজ তিনি কখনোই করবেন না। কাজেই আশরাফ চৌধুরীকে মন্দির দেখালেও অসুবিধে নেই।

তবে আশরাফ চৌধুরীকে মন্দির দেখানোর কথা সে গ্রামের মোড়লকে জানাল না। ফার্নান্দো জানত, মোড়ল তাকে যতই খাতির করুক, ভিনদেশী মানুষকে সে মন্দির দর্শন করতে দেবে না। অবশ্য মন্দির চিনতে ফার্নান্দোর অসুবিধে নেই। কারণ তার বাপ তাকে গ্রামের ম্যাপ এঁকে দিয়েছে। মন্দিরের অবস্থান তাতে চমৎকারভাবে আঁকা আছে।

আগেই বলা হয়েছে কুরাকুইরা গ্রামের মানুষ সজ্জন, ভদ্র। তারা খুব সরল এবং বিশ্বাসী। চুরি বা বাটপারি শব্দগুলোর সাথে তারা পরিচিত নয়। তাই পবিত্র মন্দিরকে তাদের পাহারা দিতেও

হয় না। পিঁপড়েরা এ মন্দির পাহারা দেয়। কারও অনুপ্রবেশ ঘটলে লাখ লাখ পিঁপড়ে চোখের পলকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, জ্যান্ত খেয়ে ফেলে। কিন্তু মন্দিরে পৌঁছে ধারে-কাছেও পিঁপড়ের 'প' ও না দেখে মনে মনে হাসলেন আশরাফ চৌধুরী। কুরাকুইরারা গল্পও বানাতে পারে বটে। আসলে মন্দিরে যাতে কেউ ঢোকার সাহস না পায় সেজন্য তারা এই গল্পটা রটিয়েছে।

পিঁপড়ে মন্দিরটা মাটির তলায়, একটা কৃত্রিম গুহার মধ্যে। মন্দির দেখে হতাশই হলেন আশরাফ চৌধুরী। এটার ভেতর এমন কিছু নেই যে মন্দিরটার কথা এভাবে গোপন রাখতে হবে। গুহাটা পুরোটাই মাটির তৈরি, তবে বেশ ঝকঝক করছে। গুহার শেষ প্রান্তে একটা বেশ বড় পাথরের বেদি, বেদির ওপর সেই পিঁপড়ে দেবতার মূর্তি।

টর্চের আলো ফেললেন আশরাফ মূর্তির গায়ে। নীলাভ দ্যুতি ছিটকে বেরুচ্ছে কিম্ভূত মূর্তিটার গা থেকে। তিনি রত্নবিদ নন, তবে মনে হলো খুব দামি পাথর হবে। ব্লু স্যাফায়ার নয়তো, তাঁর খুব ইচ্ছে হলো মূর্তিটা ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু ফার্নান্দো তাকে তাড়া দিল, 'চলুন সার।' আশরাফ চৌধুরীর মনে পড়ল তিনি ফ্রার্নান্দোকে কথা দিয়েছেন মন্দিরটা এক নজর দেখেই চলে আসবেন। বললেন, 'ঠিক আছে, চলো।' ফার্নান্দো চৌধুরীকে নিয়ে গুহার বাইরে চলে এল। তারপর হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'এক মিনিট সার। আমি এক্ষুনি আসছি।' সে ত্রস্ত পায়ে আবার ঢুকে গেল মন্দিরে।

পাঁচ মিনিটেও যখন এল না ফার্নান্দো, কৌতূহল হলো প্রফেসর চৌধুরীর। কী করছে ফার্নান্দো? তিনি পা টিপে টিপে আবার গুহার ভেতরে ঢুকলেন, দাঁড়ালেন একটা পিলারের আড়ালে। তাকালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল।

ফার্নান্দো সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে হাত পা ছড়িয়ে মূর্তিটার সামনে

চোখ বুজে পড়ে আছে, মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কী যেন বলছে, বোধহয় ওংবংচং মন্ত্র আওড়াচ্ছে। তার এক হাতে একটা ধনচি, ওখান থেকে কী যেন ফেলছে মূর্তিটার সামনে। আর সাদা রঙের জিনিসগুলো মূর্তির সামনের নীলাভ একটা কার্পেটের ওপর পড়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নীল কার্পেট কোথায়? মাগো! এ দেখছি লাখ লাখ পিঁপড়ে। পিঁপড়েগুলো দেখে ভয়ানক চমকে উঠলেন আশরাফ চৌধুরী। রসায়নের অধ্যাপক তিনি। তবে প্রাণি-বিদ্যা নিয়েও প্রচুর পড়াশোনা তাঁর। বিশেষ করে পিঁপড়ের ওপর বহু গবেষণা করেছেন। যতদূর জানেন, গাঢ় নীল রঙের এই পিঁপড়েরা বহু আগেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম 'আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাস'। ভয়ানক বিষাক্ত এই পিঁপড়ের বিষ নাকি হীরের চেয়েও দামী। শোনা কথা, এগুলোর বিষ দিয়ে ধন্বন্তরী ওষুধ তৈরি করা সম্ভব। প্রফেসর চৌধুরী পড়েছেন, পাঁচশ বছর আগে যেবার ইউরোপে মহামারীর আকার নিয়ে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন ফরাসি এক বিজ্ঞানী, লুই দ্য ফারিতাস, এই পিঁপড়ের বিষ দিয়ে প্লেগের মহৌষধ তৈরি করেন। তিনি এই পিঁপড়ের সন্ধান পান আমাজানে এসে। তিনি লিখেছেন, 'কুরাকুইরাদের গ্রাম থেকে কয়েক শ' মাইল দক্ষিণে, এক বিশাল মাটির ঢিবির নীচে এই পিঁপড়েগুলোর দেখা পেয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে ওই এলাকা ভয়ানক এক ভূমিকম্পে মাটির নীচে তলিয়ে যায়। এখন ওদিক থেকে বয়ে চলেছে খরস্রোতা আমাজান নদ। হতে পারে আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাসরা ভূমিকম্পের পরে, যারা বেঁচে ছিল, শত শত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কুরাকুইরাদের গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো শত মাইলের মধ্যে নিজেদের উপযোগী বাসস্থান তারা খুঁজে পায়নি, আস্তানা হিসেবে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল এই গ্রামের মাটির এই গুহা। এবং এখানে তারা মনের সুখে বংশবৃদ্ধি করেছে। তবে এই পিঁপড়েদের কেন দেবতা জ্ঞানে

পূজা করা হয় বুঝতে পারলেন না চৌধুরী। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকায় এরকম শত শত উপজাতি আছে যারা নানা কীট-পতঙ্গের পূজা করে থাকে। ভারতে প্রফেসর চৌধুরী নিজের চোখে দেখেছেন–এক মন্দিরে বিষাক্ত গোখরাকে দুধ আর ফল দিয়ে পূজা করছে হাজার হাজার মানুষ। এ-সব অনেকের কাছে কুসংস্কার মনে হতে পারে কিন্তু পূজারীদের তাতে কিছু এসে যায় না।

'আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাস' প্রজাতির পিঁপড়েদের দেখে উত্তেজনায় বুক রীতিমত ঢিবঢিব করতে লাগল প্রফেসর চৌধুরীর। সেই ফরাসি বৈজ্ঞানিকের লেখা পড়ে গত কয়েক শ' বছরে অনেকেই আমাজানের নানা অঞ্চলে ঢুঁ মেরেছে এই পিঁপড়েদের খোঁজে। কিন্তু কেউ সন্ধান পায়নি। আর তাঁর সামনে, কয়েক গজ দূরে কিনা তারা লাখে লাখে জড়ো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওহ্ এগুলোকে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। ধন্বন্তরী সেই ওষুধ যদি তৈরি করতে পারেন চৌধুরী...মানস চোখে স্বপ্ন দেখলেন সুইডিশ রয়েল একাডেমি তাঁকে সর্বরোগহরা মেডিসিন আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দিচ্ছে...দেশে ফিরেছেন চৌধুরী। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে এসেছেন গোটা দেশ জুড়ে তাঁকে নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেন আর ড. ইউনুসের পরে তিনিই চতুর্থ বাঙালি যিনি এই বিরল সম্মানে ভূষিত হলেন। দৃশ্যগুলো কল্পনা করে ক্ষণে ক্ষণে তিনি শিহরিত হলেন। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান প্রফেসর চৌধুরী ঢাকার অত্যন্ত নাম করা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। খানিকটা খেপাটে স্বভাবের এই প্রফেসরকে নিয়ে আড়ালে আবডালে সহকর্মীরা হাসাহাসি করত। কারণ তিনি প্রায়ই বলতেন যুগান্তকারী কিছু একটা ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলবেন। তাঁর খেপামি উন্মাদনার পর্যায়ে চলে গেলে বিভাগীয় প্রধান একদিন খুব করে

বকে দেন প্রফেসরকে। রাগে-দুঃখে আর অপমানে চাকরি ছেড়ে দেন তিনি। এবং শেষে দেশ ত্যাগ করেন। লাপাজের এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি বিভাগীয় প্রধান তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনিই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে চৌধুরীর চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। প্রফেসর চৌধুরীর একাডেমিক রেজাল্ট অসাধারণ বলে চাকরিটা পেতে অসুবিধে হয়নি। প্রথমে বন্ধুর সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করলেও পরে নিজের যোগ্যতা বলে বিভাগীয় প্রধান হয়ে বসেন। অবশ্য ততদিনে বন্ধুটি অবসর গ্রহণ করেছেন।

এখন এই বিরল প্রজাতির পিঁপড়েদের দিয়ে যদি যুগান্তকারী ওষুধ আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজটা বাগিয়ে নেয়া যায় তা হলে তাঁর এক কালের হিংসুটে সহকর্মীদের থোতা মুখ কীভাবে ভোঁতা হয়ে যাবে, ভেবে পুলকিত হয়ে উঠলেন প্রফেসর চৌধুরী। সিদ্ধান্ত নিলেন কাজটা এক্ষুনি সেরে ফেলবেন তিনি। পরমুহূর্তে মত বদলালেন। ফার্নান্দো উচ্চ শিক্ষিত হলেও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মোটেই মুক্ত নয়। মন্দির, পিঁপড়ে দেবতা ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বিশ্বাস এবং ভক্তি যে অগাধ তার প্রমাণ তো দেখাই যাচ্ছে। ওকে এখন যদি তিনি প্রস্তাব দেন, 'ফার্নান্দো, চলো আমরা বিরল প্রজাতির এই পিঁপড়ে এক বস্তা নিয়ে কেটে পড়ি। তারপর ধন্বন্তরী ওষুধ আবিষ্কার করতে পারলে দু'জনেই নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যাব।' ফার্নান্দো কি রাজি হবে তাঁর কথায়? উঁহুঁ, মনে হয় না। তারচে', একা বরং তিনি আসবেন এখানে। কাজ সেরে কেটে পড়বেন। সাগরেদকে কিছু বলার দরকার নেই।

প্রফেসর চৌধুরী চুপি চুপি আবার বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। কিছুক্ষণ পরে বেরুল ফার্নান্দো, হাতে একটা পোঁটলা। আড়চোখে প্রফেসর লক্ষ করলেন পোঁটলার ভেতরে সাদা সাদা সেই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে।

ফার্নান্দো হেসে বলল, 'চলুন, সার। মন্দিরে একটা জিনিস

ফেলে এসেছিলাম। খুঁজে পেতে দেরি হলো।'

প্রফেসর কিছু বললেন না, মনে মনে হাসলেন শুধু। তারপর দু'জনে মিলে হাঁটা দিলেন গ্রামের দিকে।

সেই রাতে আবার পিঁপড়ে মন্দিরে এসে হাজির হলেন আশরাফ চৌধুরী। একা। এবার রীতিমত প্রস্তুত হয়েই এসেছেন তিনি। কীটনাশক অ্যারোসল নিয়ে এসেছেন পিঁপড়ে মারার জন্য, কাঁধে বড় বস্তাও আছে। এক হাতে ফার্নান্দোর সেই পোঁটলাটা। ওটা ফার্নান্দো তার বিছানার নীচে রেখে দিয়েছিল। ঘুমাচ্ছিল ফার্নান্দো, জিনিসটা চুরি করে নিয়ে এসেছেন প্রফেসর।

দিনের বেলায় ভাল মত গুহার লোকেশন দেখে গেছেন আশরাফ চৌধুরী। টর্চের আলো জ্বেলে পথ চিনে মন্দিরে আসতে তেমন অসুবিধে হয়নি। গুহায় ঢোকার আগে হ্যাভারস্যাক থেকে একটা মশাল বের করে আগুন জ্বালালেন। মুহূর্তে আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ। মন্দিরের ভেতরে ঢোকার সময় কেন যেন গা ছমছম করে উঠল তাঁর। চারদিকের অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা এর কারণ হতে পারে। সকালে দূর থেকে টর্চের আলোতে পিঁপড়ে দেবতাকে ভালভাবে দেখতে পারেননি চৌধুরী। এবারে মশালের আলোতে দেখলেন। মূর্তিটা আসলে আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাসের আদলে তৈরি। লম্বায় ফুট খানেক হবে। চোখ জোড়া মহা মূল্যবান কোনও পাথর দিয়ে তৈরি। টকটকে লাল। মূর্তিটার গা থেকে নীলাভ দ্যুতিটা মশালের আলোতে মনে হলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। পাথরটা ব্লু স্যাফায়ার হতে পারে। তা হলে তো এটার দাম কয়েক কোটি টাকা। খচ্ করে লোভের কাঁটা বিঁধল প্রফেসরের বুকে। তিনি তো আজ রাতেই কেটে পড়ছেন। দরকার হলে সরাসরি ঢাকা চলে যাবেন। সাগরেদ ফার্নান্দো তাঁর ঢাকার ঠিকানা জানে না। আর একবার দেশে ফিরতে পারলে ফার্নান্দোর বাপও তাঁকে খুঁজে পাবে

না। মূর্তিটা চোরা বাজারে বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে তিনি দিব্যি গোপনে গবেষণা করতে পারবেন। মূর্তিটা অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের কাছে থেকে কী লাভ? বরং এই মূর্তি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে মানব কল্যাণের গবেষণায় ব্যয় করতে পারবেন প্রফেসর চৌধুরী। নিজের যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি পিঁপড়ে দেবতার দিকে হাত বাড়ালেন এবং সাথে সাথে জমে গেলেন। মশালের কাঁপা আলোয় কার যেন ছায়া দেখতে পেয়েছেন আশরাফ চৌধুরী।

ধীরে ধীরে ঘুরলেন তিনি। মন্দিরের প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে ফার্নান্দো। মশালের আলোয় তার চোখ ধিকি ধিকি জ্বলছে, দৃষ্টিতে প্রবল ঘৃণা।

কঠিন গলায় বলল ফার্নান্দো, 'ছিঃ সার! শেষ পর্যন্ত আপনি আমাদের পবিত্র মন্দিরের দেবতাকে চুরি করতে এসেছেন। ভেবেছিলেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আর এই সুযোগে আমাদের দেবতাকে চুরি করে কেটে পড়বেন। ছিঃ!'

ধরা পড়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর, নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে চেষ্টাকৃত হাসি হেসে বললেন, 'না! না! বিশ্বাস করো অমন কোনও মতলব আমার নেই। আমি এসেছিলাম আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাসের সন্ধানে।'

'আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাস!'

'আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাসের নাম শোনোনি? ওই যে সকালে নীল রঙের যে পিঁপড়েগুলোর সামনে তুমি পুজো দিচ্ছিলে।'

'আপনি সেই পবিত্র পিঁপড়ে ধরে নিতে এসেছেন!' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো ফার্নান্দো।

'নয় কেন? এগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগবে। এই পিঁপড়ের বিষ দিয়ে ধন্বন্তরী ওষুধ তৈরি করা যায়। তা জানো? সেই ওষুধ তৈরি করতে পারলে তুমি আমি দু'জনেই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারি।'

'নিকুচি করি আপনার নোবেল প্রাইজের। আমাদের পবিত্র পিঁপড়ের গায়ে আপনাকে হাত দিতে দেব না।' রাগে রীতিমত কাঁপছে ফার্নান্দো।

ওর প্রতিক্রিয়া দেখে খুবই অবাক হলেন প্রফেসর। ছেলেটা বিজ্ঞানের ছাত্র, অথচ সাংঘাতিক ফ্যানাটিক। এই যুগে এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে চলে? কিন্তু ফার্নান্দো যাই বলুক, বিখ্যাত হওয়ার এমন মওকা তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। প্রয়োজনে ফার্নান্দোকে তিনি...

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটা মনে পড়ল তাঁর। ফার্নান্দো যেমন ফ্যানাটিক, সে নিশ্চয়ই তাঁর মন্দিরে অনুপ্রবেশের ঘটনা গ্রামের লোকজনদের জানিয়ে দেবে। ওরা তা হলে প্রফেসরের ছাল ছাড়াবে। নাহ্, এ ব্যাপারটা কিছুতেই বাইরে চাউর হতে দেয়া যায় না।

'ঠিক আছে, ফার্নান্দো,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন তিনি, 'তোমার কথাই রইল। নোবেল প্রাইজের দরকার নেই। চলো, বাড়ি ফিরি।'

মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল ফার্নান্দো। বলল, 'আচ্ছা, চলুন, তবে এ ধরনের কাজ আর কখনও করবেন না।'

'নাও, এটা ধরো,' বলে হ্যাভারস্যাকটা ছুঁড়ে দিলেন প্রফেসর ফার্নান্দোর দিকে, ওর পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। নিচু হলো ফার্নান্দো, হ্যাভারস্যাকটা তুলবে, ভোজবাজির মত প্রফেসরের হাতে উঠে এল একটা পিস্তল, ফায়ার করলেন তিনি। বন্ধ ঘরে বিস্ফোরণের মত শোনাল আওয়াজটা। ফার্নান্দোর চাঁদিতে গোল একটা ফুটো সৃষ্টি হলো, ফিনকি দিয়ে বেরুল মগজ আর রক্ত, মাটিতে ঢলে পড়ল সে, মারা গেছে আগেই।

দ্রুত মহামূল্যবান পিঁপড়ে দেবতার মূর্তি হ্যাভারস্যাকে ঢোকালেন আশরাফ চৌধুরী। চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকালেন।

কোনও পিঁপড়ে দেখা যাচ্ছে না। পিঁপড়েগুলো সব গেল কোথায়? তাঁর ভয় হলো গুলির আওয়াজ গ্রামের লোকজন শুনতে পেয়েছে কিনা। তা হলে হয়তো এক্ষুনি ছুটে আসবে। তিনি পোঁটলা খুলে খইয়ের মত সাদা জিনিসটা চারপাশে ছড়াতে লাগলেন। ফার্নান্দোকে দেখেছেন সকালে এভাবে ছড়াতে। কিন্তু একটা পিঁপড়েও এল না। হঠাৎ তাঁর পিলে চমকে দিয়ে দূরে কোথাও দ্রিম দ্রিম শব্দে বেজে উঠল ঢাক। সর্বনাশ! আঁতকে উঠলেন প্রফেসর। কুরাকুইরারা নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে তাঁর মতলব। হয়তো এদিকেই আসছে। ধরতে পারলে জ্যান্ত ছাল ছাড়াবে নয়তো পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়াবে।

পিঁপড়ে! মনে পড়ল বুড়ো দারোয়ান মিনুয়েল লোপেজের কথা, 'কুরাকুইরারা এমনিতে খুব ভদ্র। কিন্তু ওদের সাথে কেউ বেঈমানী করলে তাদের ভয়ানক শাস্তি দেয় ওরা। পালো সান্তো বা পবিত্র বৃক্ষের সাথে বাঁধে বিশ্বাসঘাতক শত্রুকে। ওই গাছে এক ধরনের পিঁপড়ে আছে, আগুনে পিঁপড়ে, শিকারের গন্ধ পাবার সাথে সাথে গাছের গুঁড়ির গর্ত আর ডালপালা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসে ছেঁকে ধরে শিকার। মনে হয় আগুন ধরে গেছে গায়ে, এমনই জ্বালা ওদের দংশনে। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে মারা যায় শত্রু।'

কথাটা মনে পড়তে গা শিরশির করে উঠল প্রফেসর চৌধুরীর। দরকার নেই বাপু আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাসের। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি গ্রহণ করাই শ্রেয়। কোনও মতে নদীর তীরে পৌঁছুতে পারলেই হলো, ওখানে ক্যানূ রেডি আছে, একেবারে পগারপার। রাস্তা তো চেনাই রইল। পরে সুযোগ এবং সুবিধে মত বিরল প্রজাতির এই পিঁপড়েদের রাজ্যে হানা দেয়া যাবে।

হ্যাভারস্যাকটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলেন চৌধুরী, ঢাকের আওয়াজ ক্রমশ কাছে চলে আসছে, দ্রুত পা বাড়ালেন তিনি গুহার দিকে, মন্দির চত্বর শেষ হবার পরেই গুহার লম্বা টানেল শুরু, টানেলের

মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ভয় এবং আতঙ্কে তাঁর চোখ কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

পিঁপড়ে! সেই বিরল প্রজাতির এক ইঞ্চি লম্বা পিঁপড়ে। গোটা টানেল জুড়ে। যেন গাঢ় নীল রঙের একটা কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হয়েছে টানেলে, মশালের আলোয় চকচক করছে। ক্ষুরধার চোয়ালগুলো খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, রোমহর্ষক একটা শব্দ হচ্ছে 'কটর কট্! কটর কট্!' প্রফেসরের চকিতে মনে পড়ে গেল ফরাসি বিজ্ঞানীর পাঁচ শ' বছর আগে লেখা সেই সাবধান বাণী। 'আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাসদের মত ভয়ঙ্কর পিঁপড়ে পৃথিবীতে নেই। আমাজানের সবচে' বিষাক্ত, সবচে' শক্তিশালী আর সবচে' হিংস্র কীট এই পিঁপড়ে কুল। এদের দংশন গোক্ষুরের চেয়েও মারাত্মক। আমি নিজের চোখে দেখেছি বিশালকায় বন্য বরাহ এবং প্রকাণ্ড অ্যানাকোন্ডাকে এরা কয়েক মিনিটের মধ্যে শুইয়ে ফেলেছে, আধ ঘণ্টা পরে তাদের সাদা ধবধবে কঙ্কালটা শুধু পড়ে ছিল মাটিতে। মাংসাশী, হিংস্র স্বভাবের এই পিঁপড়েদের আমাজানের মানুষ তো বটেই, সব ধরনের জীব জানোয়ারও ভয় করে চলে।'

সম্মোহিতের মত কোটি কোটি পিঁপড়ের বিশাল ঝাঁকটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন আশরাফ চৌধুরী, চমক ভাঙল নীল কার্পেটটাকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখে। এগোতে শুরু করেছে ওরা সামনের দিকে, প্রফেসরকে লক্ষ্য করে।

এক লাফে পিছিয়ে এলেন আশরাফ, দ্রুত হাতে হ্যাভারস্যাক খুলে অ্যারোসলের স্প্রেটা বের করলেন, টিপে ধরলেন স্প্রে গান। নাচানাচি শুরু হয়ে গেল পিঁপড়েদের মধ্যে শক্তিশালী কীটনাশকের আক্রমণে। ওদের করুণ দশা দেখে হা হা করে হেসে উঠলেন প্রফেসর। স্প্রেগানের বোতামে আঙুল চেপে ধরে রাখলেন তিনি। হিস্স্ শব্দে স্প্রে হতে লাগল ওষুধ। কাতারে কাতারে মরতে শুরু করল আন্টাডাসিয়া ফাট্রাকুলাসরা। হঠাৎ হিস্স্ শব্দটা বন্ধ হয়ে

গেল। আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন প্রফেসর—ওষুধ শেষ। অথচ সিকিভাগ পিঁপড়েও মরেনি। হামলাকারী নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে পিঁপড়ের দল আবার আগে বাড়তে শুরু করল, ওদের চোয়াল খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, সেই সাথে সেই ভীতিকর শব্দটা হচ্ছে, 'কটর কট্! কটর কট্!'

ভয়ে কাঁপতে লাগলেন প্রফেসর। বিস্ফারিত হয়ে গেছে চোখ, ঘামে ভিজে গেছে শরীর। হঠাৎ ব্রেক কষলেন তিনি। পেছন থেকেও সেই ভয়ঙ্কর শব্দটা আসছে। 'কটর কট্! কটর কট্!' ধীরে ধীরে ঘুরলেন প্রফেসর। মন্দিরের বেদি বেয়ে পিলপিল করে নেমে আসছে নীল রঙের পিঁপড়ের দল, গোটা মন্দিরের ব্যাপ্তি জুড়ে এগোচ্ছে তারা।

'না!' আর্তনাদ করে উঠলেন প্রফেসর। 'কাছে আসবি না!'

কিন্তু ওরা তাঁর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। সমান ছন্দে, ভয়াল চোয়ালের সারি খুলছে আর বন্ধ করছে, ভীতিকর শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলছে দেয়ালে, ওরা এগোতেই থাকল। টানেলের দিকে চট করে ঘুরলেন প্রফেসর। মৃত সঙ্গীদের লাশের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে বাকি পিঁপড়েরা। পকেট থেকে পিস্তল বের করলেন প্রফেসর, গুলি করবেন। হঠাৎ তাঁকে ভয়ানক চমকে দিয়ে ঠিক মাথার ওপরে আওয়াজ শুরু হয়ে গেল 'কটর কট্! কটর কট্!' তাকাবেন না তাকাবেন না করেও ওপর দিকে মুখ তুলে চাইলেন আশরাফ চৌধুরী, তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেল, কোটর থেকে ছিটকে পড়তে চাইল চোখ জোড়া, গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এল সুতীব্র আর্তচিৎকার 'না-আ-আ-আ!' কাঁপা হাতে পিস্তলের ট্রিগার টিপতে যাচ্ছেন তিনি, ঠিক তখন গুহার ছাদের সাথে লেপ্টে থাকা নীল রঙের জ্যান্ত, কিলবিলে একটা কার্পেট খসে পড়ল, মুহূর্তে নীচে চিৎকার করতে থাকা আশরাফ চৌধুরী নিজেই পরিণত হলেন নীল কার্পেটে।

***